দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

মানহায আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল – ১ম পর্ব..... ৪

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল - পর্ব ২.....৮

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল - পর্ব ৩.....১২

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল - ৪র্থ ও শেষ পর্ব ১৭

তাওহীদ এবং জিহাদের মধ্যে সম্পর্ক ও আমাদের বুঝ ২৫

মুরজিয়া ও কুফর-শায়খ সুলাইমান আল-উলওয়ান ৩১

তালেবানরা কি জাতীয়তাবাদী? - আইএস অনুসারীদের মিথ্যাচারের জবাব!... ৩৫

আলকায়েদা ও তালেবানের মানহাজগত পার্থক্য : প্রোপাগান্ডা ও বিশ্লেষণ ৪১

তথাকথিত গনতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কুরআনী শাসন কায়েম করার দাবি একেবারে অযৌক্তিক..... ৫০

যে কাজের দ্বারা হক্ব প্রতিষ্ঠা হয়, কাফেররা তা বন্ধ করে দিতে চায়..... ৬৬

ইলাহ কী? ৭০

তাওহীদের দ্বিতীয় রূকন "ঈমান বিল্লাহ" কি? ৭৮

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল – ১ম পর্ব

knight

Junior Member

০৭-০৮-২০১৮

How Al-Qaeda Works: The Jihadist Group's Evolving Organizational Design

মূল লেখার লিংকঃ

https://www.hudson.org/research/১৪৩৬...ational-design

* লেখার ভাবানুবাদ করা হয়েছে লেখাটি দুই জন কাফির থিংক ট্যাংক Daveed Gartenstein-Ross & Nathaniel Barr এই দুইজনের লেখা। Hudson Institute থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্র।

এখানে আল-কায়েদার উত্থান তার সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। যদিও কিছু কিছু আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মনে করেছিল ওসামা বিন লাদেন রাহিঃ এর শাহাদাতের পরে আল কায়েদা অচল হয়ে যাবে বা আল কায়েদার প্রবীণ নেতাদের হারানোর আঘাত এই দল আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা , আধুনিক যুগের জিহাদের সুচনা লগ্নে যারা এই কাজের আঞ্জাম দিয়েছিলেন তারা ছিলেন উস্তাদ সাইয়েদ কুতুব রাহিঃ ও ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিঃ । উনাদের ইলমী দক্ষতা ও ত্যাগের কারণে একদল যুবক উম্মাহ এর গতিপথ পরিবর্তনে জিহাদের পথ বেছে নেয়। ১৯৮০ সালে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিঃ উনার আল কায়েদা আল সুবাহ (শক্ত ভিত্তি) নামের একটি লেখায় এমন এক দলের কথা বলেন যারা এই অন্ধকারে উম্মাহকে পথ দেখাবে কুফর শক্তিকে নির্মুল করার জন্য অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করবে।

শাইখের এই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েই আল কায়েদা গঠিত হয় এবং তাকে উম্মাহ এর পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করার জন্য মূলত ৩টি টার্গেট পূরণ করা জরুরী হয়ে পরে সেগুলো হচ্ছেঃ

১) আল কায়েদার একটি শক্তিশালী মিডিয়া গঠন যা দিয়ে তারা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছায় দিতে পারবে,

২) সারা দুনিয়াতে তার আন্ডারে কাজ করা জিহাদী তানজিমদের সামরিক

৩) কৌশলগত দিক নির্দেশনা নিয়মিত পৌছানো ও নিজেদের খুবই পরিবর্তন সক্ষম রাখা যাতে অনেক বড় আক্রমণ বা নেতাদের হারানোর মত দুর্যোগ সহজে মোকাবেলা করতে পারে।

কিন্তু এই গবেষণা শুধু আল কায়েদা সারা দুনিয়াতে তাদের তানজিম গুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও এর নিজের উপরে আসা আক্রমণ প্রতিহত করে টিকে থাকার কৌশল গুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

আল কায়েদার প্রথম মিটিং হয় ১৯৮৮ সালে, এই মিটিং এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিঃ পরিচালিত মাকতাব আল খিদমাত সাংগঠিক দুর্বলতা এর অন্তর্কলহ ও এর এই দুর্বলতা কাটিয়ে নতুন এক দলের নকশা প্রণোয়ন। এর একটি উদাহরণঃ আল কায়েদা আমির ভিত্তিক শুরা সদস্য দ্বারা পরিচালিত হবে যার প্রতি সদস্যকে উপরের আদেশ মেনে চলতে হবে এবং দল প্রতি কাজের জন্য আলাদা আলাদা কমিটি থাকবে যাদের দায়িত্ব থাকবে আলাদা। প্রাথমিক যুগেই তা কেমন সুসংগঠিত ছিল তার একটি প্রমাণ এই যে আল কায়েদার একজন মিলিটারি কমান্ডারের নূন্যতম যোগ্যতা তাকে কমপক্ষে ৫ বছর যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাতে হবে , ৩০ বছর বয়স হওয়া লাগবে আর একটি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী. ৯/১১ পরবর্তী আল কায়েদার আরেকটি বড় অর্জন হচ্ছে নির্দেশনার কেন্দ্রীকরণ ও কার্যকরণের বিকেন্দ্রীকরণ, মানে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ভাবে দেয়া হবে আর তা বাস্তবায়ন হবে স্থানীয় অথরিটির মাধ্যমে।

আল কায়েদার নেতৃত্ব ও অভ্যন্তরীণ গঠন নিয়ে কমব্যাটিং টেরোরিজম সেন্টার থেকে একটি গবেষণায় কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো এমন যে, আমীর এখানকার মূল ক্ষমতার অধিকারী। আমীর সমস্ত কমান্ডার ও শুরা কাউন্সিলের মেম্বারদেরও নির্বাচন করে দেন। যদিও এই কাউন্সিলের একটি দায়িত্ব হচ্ছে আমিরকে অপসারণ কিন্তু এর কার্যকরী পদক্ষেপ বাস্তবে নেয়া কঠিন। আমীরের এই একচ্ছত্র ক্ষমতা ও এর ব্যাপকতার কারণে আমীরের দৈনন্দিন কাজে

অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পরে যার ফলে এই দায়িত্ব থাকে নির্দিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যানের উপর।

৯০ এর দশকে আল কায়েদার কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না তবে আফগান বাদশা জহীর শাহকে হত্যা করতে চাওয়া সান্তোসের ওসামা বিন লাদেন রহঃ এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের বিষয়টি একটি জিনিস পরিষ্কার করে যে, ৯/১১ এর আগের আল কায়েদাতে এখনকার মত শৃঙ্খলা বা চেইন অফ কমান্ড ছিল না। ব্যাপারটা এমন ছিল যে কেউ চাইলেই এট্যাকের প্ল্যান নিয়ে সরাসরি হাই অফিসিয়াল, অনেক সময় ওসামা বিন লাদেন রহঃ এর কাছে যাওয়ার সুযোগ পেত পরে আল কায়েদা সেটা যাচাই বাচাই করে তা পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত কমান্ডারকে দায়িত্ব দিত।

সান্তোস ও ওসামা বিন লাদেন রহঃ এর বডিগার্ড নাসের আল বাহরি দুইজনের বক্তব্য থেকেই এটা স্পষ্ট যে ওসামা বিন লাদেন অপারেশন কিভাবে করতে হবে সে ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না বরং তা কোন একজন মিড লেভেলের কমান্ডার বা এলাকার কমান্ডার করতেন। তিনি শুধু এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও দরকার হলে লজিস্টিক সাপোর্ট দিতেন।

আল কায়েদার সেই কেন্দ্রীকরণ ও কার্যকরণের বিকেন্দ্রীকরণ আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে বরং এই কৌশলের কারণেই আল কায়েদা তার পরিবর্তনশীল মানহাজ ধরে রাখতে পেরেছে ফলে তাদের মধ্যে বৈচিত্র বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটদের ফাকি দেয়ার নিত্য নতুন কৌশল আয়ত্ব করতে সক্ষম হচ্ছে। একি সাথে এর ফলে গ্রাউন্ডে থাকা স্থানীয় অপারেটিভ কমান্ডারদের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেয়া, রিস্ক নেয়া, নেতৃত্ব এইসব গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি তাদের আরেকটি সফলতা যে গুরুত্বপূর্ন লিডারদের হঠাৎ অপসারণের পরেও আল কায়েদার সাংগঠনিক কার্যক্রম দূর্বল হয়ে পরছে না।

আল কায়েদার কাজের এই পদ্ধতি কিছু বিশ্লেষকদের মধ্যে আল কায়েদার নেতৃত্বের কার্যকরিতা নিয়ে কনফিউশন তৈরী করেছে। বিশেষ করে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে ওসামা বিন লাদেন সহ অন্যান্য সিনিয়র কমান্ডারদের অপারেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করা এই বিশ্লেষকদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি করে যে আল কায়েদা তার শাখাগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। আল কায়েদার নেতৃত্বকে বিচার করার

জন্য তাদের সিনিয়র কমান্ডারদের প্রতিদিনের অপারেশন বা শাখা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা খোঁজা খুবই অকার্যকর পদক্ষেপ যেখানে সিনিয়র কমান্ডারদের কাজ সংগঠনের সার্বিক লক্ষ্য এর বাজেট ইত্যাদি কাজ করা। এই কাজ করার পর একজন আমীরের কাজ শুধুই তত্ত্বাবধায়ন করা।

... চলবে ইনশাআল্লাহ।

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল - পর্ব ২

ওসামা বিন লাদেন রহঃ ও তার উত্তরাধিকারী আইমান আল যাওয়াহিরি হাফিঃ এই কার্যপদ্ধতির বাস্তবায়ন করেছেন। যদিও সরকারের ভিতরের ও বাইরের নানা বিশ্লেষক একে আল কায়েদার অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীকরণ ও বিস্তারের কারণ বলেছে কিন্তু ফাযুল আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ (১৯৮৮ সালের এম্ব্যাসি বোম্বিং এর প্ল্যানার) এর জবানবন্দিতে এর থেকে ভিন্ন কথা এসেছে । একি রকম কথা আসসাফ মোগমাহেদ বলেছে, যে আল কায়েদার কর্ম পদ্ধতি উপর থেকে নিচের দিকে মানে কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠনের উপরের লোকদের নিচের লোকদের দরকার হয়। অথচ এই একি লোক আর্টিকেলের প্রথমে এর বিপরীত কথা বলেছিল। আসলে আল কায়েদা একটি বৈচিত্রময় ও বহু মাত্রিক সংগঠন যা যেকোন রকম যুদ্ধকৌশল গ্রহন করতে পারে।

আল কায়েদা তার কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছে এই সংগঠনের মধ্যস্ততাকারী ও নবীন কমান্ডার নিয়োগের ফলে। কিন্তু এটি আবার সিনিয়র কমান্ডের অবাধ্য হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের দ্বারা অন্তর্কোন্দলের মতঘটনাও তৈরি করছে। যেমন আমরা আইএস এর কথা বলতে পারি যা সৃষ্টিই হয়েছে সেন্ট্রাল কমান্ডের সাথে শাখার বিবাদের ফলে। কিন্তু এই ব্যপারটির বিপরীত প্রভাবও দেখা যায় এইভাবে যে আল কায়েদার শাখা সংগঠনের ফলে এমন শক্তি সে প্রদর্শন করতে পারে যা নিজে থেকে হয়ত তার সামর্থের বাইরে ছিল এবং এটি অন্যান্য সংগঠনের সাথে তাদের নেতৃত্বের সম্পর্ক জোরদার করে।

আল কায়েদার সাংগঠনিক তৎপরতা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য আমাদের দুইটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম, শাখা সংগঠন বা অধিনস্ত কমান্ডারদের সাথে সিনিয়র নেতাদের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, যদিও আল কায়েদা স্থানীয় কমান্ডারদের যথেষ্ট স্বাধীনতা অপারেশন পরিচালনা করার জন্য দেয় তবুও প্রেক্ষাপট পরিবর্তন ভবিষ্যৎ কজের প্ল্যান তৈরি ইত্যাদির জন্য তা গুরুত্বপূর্ন। দ্বিতীয়ত তার অঙ্গসংগঠনদের কার্যক্রম নিজের লক্ষ্য বা নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা ও এর নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও আল কায়েদা তার শাখার কার্যক্রমের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয় তবুও মাঝে মাঝে সমস্যা হয় যখন স্থানীয় কমান্ডার নিজের

লাভ ক্ষতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ন লক্ষ্য বা কাজের আগে চলে আসে। এই দুইটি কাজের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য আল কায়েদার নেতৃবৃন্দের সংগঠনের নিয়ম সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে এবং তাদের অধিনস্তদের ব্যপারেও সজাগ থাকতে হবে। ৯/১১ এর আগে আল কায়েদা যেকোন বিচ্যুতির ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিলেও বর্তমানে সেই নিয়ন্ত্রণ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এর পিছনে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকা ক্রমান্বয়ে বিশ্বের নানা জায়গায় সংস্থার শাখা পৌছে যাওয়া অন্যতম। যদিও বর্তমানে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান লক্ষ্যে থাকার কারণে তাদের আদর্শিক নেতা হিসেবে পাব্লিক ভর্তসনার মাধ্যমে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল কায়েদা নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট সম্মানবোধ ও উন্নত মানের আনুগত্য চর্চা করে। আর তাদের এই শক্ত বন্ধন প্রায় সময় যুদ্ধের ময়দানে, নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী আল কায়েদা এমন এক লক্ষ্য ও ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে যার প্রতি এর শাখা সংগঠন খুব দৃঢ় ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এই অনন্য আনুগত্যই সংগঠনের একাত্নতা ও সংঘবদ্ধ থাকার প্রধান উৎস যা অনেক বিশ্লেষক অবমূল্যায়ন করেছিল। এবং আইসের উথ্যানের সময় এই ধারণা তাদের মধ্যে প্রবল হয় যে আল কায়েদার শাখা সমূহ এই সংগঠন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এই আনুগত্য আল কায়েদাকে এক দমনমূলক শক্তি দেয় যার ফলস্বরূপ আল কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা সেন্ট্রাল কমান্ডের সাথে সংঘর্ষ করে কোন দল স্থানীয় জিহাদি সংগঠনের সাহায্য সহমর্মিতা লাভ করতে পারে না। ২০১৫ সালের বোকো হারাম এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

আল কায়েদার ইতিহাসে যেই পরীক্ষাগুলো তাদের সামনে এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাখা সংগঠনের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা, কার্যকর সুশৃঙ্খল অঙ্গসংগঠন ও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আঘাতের সময় দলীয় ঐক্য। যদিও অনেক সময় এই দল অনেক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে তারপরে অনেক এনালিস্টের ভবিষ্যৎ বানীকে ভুল প্রমাণ করে, তার নির্দেশনার কেন্দ্রীকরণ ও কার্যকরণের বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করে যেই ফাউন্ডেশনের উপর আল কায়েদা গড়ে উঠেছিল তা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

প্রথম পরীক্ষাঃ

যদিও মনে করা হয় আল কায়েদার সাংগঠিক গঠনের উপরে প্রথম হামলা ২০০১ সালের আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমনের মাধ্যমে হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়েছিল তার প্রায় ১ যুগ আগে ১৯৮৯ সালে। তখন ওসামা বিন লাদেন রাহিঃ এর পরোক্ষ অবদানে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে বেঞ্জীর ভুট্টোর সরকারের বিপক্ষে অনাস্থা ভোট পাশ করাতে সক্ষম হয়। এরপর উনি সুদানে চলে গেলে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নাজিবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের পতন হয় এবং জিহাদি দলগুলোর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। এর ঠিক পরপর ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয় ধাক্কা আসে যখন পাকিস্তানী সরকার আমেরিকার চাপে দেশ থেকে আরবদের ফেরত পাঠানো শুরু করে। এইদুই ঘটনা অই অঞ্চলে আল কায়েদার অবস্থা সংকটে ফেলে দেয়।

এই ধাক্কা খুব তাড়াতাড়ি তারা কাটিয়ে উঠে নিজেদের কার্যক্রম সুদানে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে। সেখানে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, সম মানসিকতার জিহাদি দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন সৃষ্টি করার মাধ্যমে সারা বিশ্বের জিহাদি দলগুলোর সাথে যোগাযোগ তৈরী। এই কাজ সংগঠিত হয় "ইসলামিক আর্মি শুরা" নামের একটি সংস্থার সৃষ্টির মাধ্যমে। এর মধ্যে আল কায়েদার নিজেদের শুরা সদস্য ছাড়াও সৌদি, মিশর, জর্দান, লেবানন, ইরাক, ওমান, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, মরোক্ক, সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়া এর বিচ্ছিন্ন জিহাদী সংগঠনের আমীরদের নিয়ে এক জোট গঠন। এছাড়াও আফ্রিকান দেশ যেমন চাঁদ, মালি, নাইজার, নাইজেরিয়া ও উগান্ডার জিহাদি দল ও দক্ষিণ এশিয়ার বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়ার দল গুলোর সাথে যোগাযোগ ছিল এমনকি বসনিয়ার যুদ্ধের সাথেও আল কায়েদার যোগাযোগ ছিল। এভাবেই একটি আন্তর্জাতিক জিহাদী সংগঠনের স্তম্ভ দাঁড়া করানো হচ্ছিল।

এই সময়ে আল কায়েদার আন্তর্জাতিক কার্যক্রম সংগঠিত হয় আফ্রিকার শিং নামে খ্যাত এলাকায়। এখানেই মিশরীয় জিহাদী নেতা আবু উবাইদাহ আর বানশিরি রহঃ এর সাহায্যে আল কায়েদার নতুন অভয়ারণ্য তৈরী হয়। এখান থেকেই অত্র এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করা হত, ১৯৯৮ সালের আমেরিকান এম্ব্যাসী আক্রমণ এর একটি অন্যতম সাফল্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ ছিল

সোমালিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার যা পরবর্তীতে আল কায়েদার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসেবে দেখা দেয় এবং আল শাবাব এর মত একটি গুরুত্বপূর্ন দল তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

তৎকালীন বিশেষজ্ঞরা সুদানে থাকা অবস্থায় আল কায়েদা গঠন সম্পর্কে আবছা ধারণা রাখত। ১৯৯৫ সালে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এই রকম একটি তথ্য দেয় যে আল কায়েদা কিছু ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী জোট যার কোন সাংগঠনিক রুপ নেই। অনেক এমেরিকান তো এমন বলেছিল যে ওসামা বিন লাদেন রহঃ জিহাদ জিহাদ খেলা খেলছে আর নিজের পারিবারিক সম্পদ ব্যয় করে খুব অল্পই অর্জন করেছে। ভিন্স কেনিস্ট্রারো সিআইএ এর কাউন্টার টেরোরিসমের প্রধান ১৯৯৮ সালে এই মন্তব্য করে যে, 'যে কোন গ্রুপ বিন লাদেনকে ফান্ডের জন্য ব্যবহার করতে পারে শুধু ব্যক্তিগত হামলা চালানোর জন্য আর বিন লাদেন তা ততক্ষন করবে যতক্ষন সেগুলো তার ধর্মীয় স্বার্থ পুরণ করবে।' এটিই ছিল বিশেষজ্ঞ দের আল কায়েদা সম্পর্কে প্রথম অবমূল্যায়ন। হ্যা অবশ্যই তখন আল কায়েদা এত সুশৃঙ্খল ছিল না তার পরেও তারা আন্তর্জাতিক অপারেশন পরিচালনা করা, অর্থ সংগ্রহ করা ও বিশ্ব ব্যাপী জিহাদীদের ট্রেনিং দেয়ার মত ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এর কিছু নমুনা জামাল আল ফাদল (যে আমেরিকার কাছে আল কায়েদা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিল দল থেকে ১০০০০০ ডলার আত্নসাতের পরে) তার জবানবন্দীতে পাওয়া যায়। অস্ত্র চালান, সারা বিশ্বে ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন ছাড়াও কেমিক্যাল ল্যাবের মত কাজও তারা সেই সময়ে করতে সক্ষম হয় এবং ১৯৯৬ সালের সুদান থেকে আফগানিস্তানে উৎখাত হওয়ার আগ পর্যন্ত বৈরী পরিবেশেও এইরকম কার্যক্রম তাড়া চালিয়ে যায়।

... চলবে ইনশাআল্লাহ।

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল - পর্ব ৩

জিহাদীদের মহীরুহঃ

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে আল কায়েদার তার সাংগঠনিক কার্যক্রমের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়। দক্ষিণ ও পূর্ব আফগানিস্তানে থাকা অবস্থায় সে তার সর্ব ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে। উন্নত মানের বহুমাত্রিক ট্রেনিং দান অসংখ্য নতুন রিক্রুটদের ব্যবস্থাপনা ও সারা বিশ্বে অসাধারণ অপারেশন চালানো যার মধ্যে সবার পরিচিত ৯/১১। আল কায়েদার সুদান থেকে আফগানিস্তান আসা সুখকর ছিল না, যদিও এর ফল ছিল চিন্তার বাইরে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা যেটা আল কায়েদার উপর আশে সেটা হচ্ছে তাদের সম্পদের অনেক বড় অংশ এখানে নতুন বেজ তৈরী করতে খরচ হয়ে যাওয়া ও সুদানে ওসামা বিন লাদেনের ৩০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া। এই সব বাঁধা পেরিয়েও আল কায়েদা মাত্র ৪ বছরের মাথায় তার নতুন রিক্রুটদের বিস্ফোরণ প্রশিক্ষণ, গেরিলা যুদ্ধ, কাগজ জালিয়াতির মত অত্যন্ত সুক্ষ সুক্ষ ট্রেনিং দিতে সক্ষম হয়। যখন আল কায়েদার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও রিক্রুট বেড়ে যায় সিনিয়র কমান্ডাররা এদের প্রমোশন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন সিস্টেম চালু করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ১৯৯৮ সালে সিনিয়র আল কায়েদা কমান্ডার ও প্রশিক্ষক আবদ আল হাদি আল ইরাকি রহঃ মিশরীয় সামরিক কমান্ডার সাইফ আল আদল হাফিঃ কে চিঠিতে এই রকম সুশৃঙ্খল একটি প্রসেস তৈরির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যেখানে নতুন রিক্রুটের শিক্ষা ধর্মীয় জ্ঞান ট্রেনিং এর পারফর্মেন্স ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদি সব তথ্য একটি ব্যক্তিগত ফাইলে থাকবে। এবং অনেক সময়ই আল কায়েদার এই পদ্ধতির প্রমান পাওয়া গেছে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের রিপোর্টার এলেন কালিসন কাবুলের এক কম্পিউটার দোকানীর কাছ থেকে আল কায়েদার খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি কম্পিউটার হস্তগত করতে সমর্থ হয় সেখানে দেখা যায় কিভাবে আল কায়েদা খুব সুচারু ভাবে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করত। তারা সেই ১৯৯৮ সালেই নিজেদের মধ্যে কোড ওয়ার্ড ও ক্রিপ্টগ্রাফির মত আধুনিক কন্সেপ্ট নিজেদের মধ্যে প্রচলন করেছিল সবচেয়ে ভয়ানক যে তথ্য সেখান থেকে পাওয়া যায় তা হল কেমিক্যাল অস্ত্রের মজুদ ও তার ক্ষমতা নির্ধারনের জন্য কুকুরের উপর তা প্রয়োগ। আল কায়েদার অত্যন্ত কঠোর ও নিয়মতান্ত্রিক সাংগঠনিক নিয়মের একটি উদাহরণ

এখানে পাওয়া যা তা হলোঃ ইয়েমেনের আল কায়েদা অফিসে একটি ফ্যাক্স মেশিন কেনা নিয়ে আয়মান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ জবাব চেয়েছেন ইয়েমেন অফিসে দুইটি ফ্যাক্স মেশিন থাকার পরেও কেন তারা আরেকটি ফ্যাক্স মেশিন কিনলো!!

ক্ষুদ্র বিষয়ে তদারকি ছাড়াও আল কায়েদা আরেকটি বৈশিষ্ট নিজেদের মধ্যে রেখেছিল তা হচ্ছে নিম্ন র‍্যাংকের কমান্ডারদের নিজে থেকে অপারেশন প্ল্যান করার স্বাধীনতা ও আল কায়েদার লক্ষ্যের সাথে মিলে গেলে তা বাস্তবায়নে সাহায্য করা। ৯/১১ এটাক ও ইউএসএস কোলের হামলা দুইটিই নিচের কমান্ডারদের থেকে উঠে আসা প্রস্তাবের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে যদিও এর মধ্যে আল কায়েদার অনেক কমান্ডার ও লজিস্টিক সাপোর্ট এর অবদান রয়েছে।

যদি আমরা আল কায়েদার সংগঠিত ৩ টি প্রধান অপারেশনকে সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাতে দেখা যাবে যে ৯/১১ এটাকে ওসামা বিন লাদেন রহঃ নিজে সেই হামলার মুজাহিদ নির্বাচন করেছেন, ইউএসএস কোল এটাকের সময়ও তিনি হামলাকারী পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এখানে থেকে আল কায়েদার কার্যপদ্ধতির বিপরীত চিত্র উঠে আসে। কিন্তু বাস্তবে তা অন্যরকম যদিও আল কায়েদা তার শাখা সংগঠনকে অপারেশন পরিচালনা করার যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয় কিন্তু একি সাথে গুরুত্বপূর্ন কাজে যোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করার কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয়। কমসেকম স্থানীয় আমীর নির্বাচন অবশ্যই কেন্দ্রীয় ভাবে করা হয়। একি সাথে এমেরিকান এম্বাসী আক্রমনের ক্ষেত্রে তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেন নি, এর কারণ এই অপারেশন পরিচালনা করেছেন আবু মুহাম্মাদ আল মাসরি রহঃ যিনি ইতোমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছিলেন।

আল কায়েদার কার্যকরণের বিকেন্দ্রীকরণের অনেক আলামত পাওয়া গেলেও এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল যে আফগানিস্তানের শেষ বছরে আল কায়েদা অত্যন্ত শক্তিশালী পেশাদার সংগঠনের মত কাজ করেছে। তারপরেও অনেক বিশেষজ্ঞ তাদের অবমূল্যায়ন করেছে এত পরের স্টেজে এসেও অনেকে একে অনানুষ্ঠানিক ভাত্রসংঘের মত দেখেছে যা শুধু কিছু জিহাদী দলের ফান্ড ট্রেনিং ও লজিস্টিক সাপোর্ট নেয়ার জায়গা দেয়। সরকারী অফিসিয়াল এই সব মন্তব্যের কারণে আমেরিকা ৯/১১ এর মত আক্রমণ কখনো কল্পনা করতে পারে নি। যদিও ৯/১১ এর আগে কিছু গোয়েন্দা রিপোর্টে এদের ট্রেনিং বা সাংগঠনিক কার্যক্রমের চিত্র

উঠে এসেছে এবং এই একটি রিপোর্টে এসেছে আফগানিস্তানে বৈশ্বিক জিহাদের প্রস্তুতি চলছে বা সেখান থেকেই সব নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তারপরেও বেশিরভাগ লোক আল কায়েদা সম্পর্কে উদাসীন ছিল এমনকি ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তেও এই ব্যপারে বিতর্ক হয়েছে যে আল কায়েদা আসলে কোন উল্লেখযোগ্য হুমকি কিনা।

কিন্তু ৯/১১ এর সেই বরকতময় হামলায় সব বিতর্কেরর অবসান হয়ে যায়। এর পরে আমেরিকার আফগানিস্তানে হামলার মাধ্যমে আল কায়েদার স্থাবর স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর সিনিয়র নেতৃত্বরা পাকিস্তান বা ইরানে চলে আসে। কিন্তু এই কঠিন দুর্যোগের সময়ও আল কায়েদা তার দলের ঐক্য ও কর্মপদ্ধতি বজায় রেখেছিল। এই ধ্বংসের ফলে আল কায়েদার কার্যক্রম পুঞ্জিভুত থেকে নানা দেশে ছড়িয়ে যায় এবং ৯/১১ এর আগের আল কায়েদা থেকে ৯/১১ এর পরের আল কায়েদা আরো বেশী ধরা ছোয়ার বাইরে ও আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

আল কায়েদার পরিবর্তনঃ

আমেরিকার আফগানিস্তানে আক্রমনের সাথে সাথে আল কায়েদার অবস্থান ও নেতৃত্ব দুইটিই হুমকির মুখে পরে। এর থেকে উত্তরণের পথ ও দলের পরবর্তী কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ২০০২ সালে ইরানে একটি মিটিং হয় সেখানে ওসামা বিন লাদেন রাহিঃ ও আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ ছাড়া বাকি অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং আবু মুহাম্মদ আস সুরী (ফাঃআঃ) বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন। এক আফগানিস্তান থেকে আর আন্তর্জাতিক অপারেশন পরিচালনা না করা যদিও এটা বাস্তবায়নের আগেই ইমারাতে আফগানিস্তান ভেঙ্গে পরে। দুই আল কায়েদাকে ভেঙ্গে দেয়া ও নেতৃত্ববিহীন জিহাদ এলাকা ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করা। যদিও দ্বিতীয় প্রস্তাব আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ গ্রহন করেন নি কারণ আল কায়েদা তৈরীই হয়েছিল বৈশ্বিক জিহাদকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য।

এর পরের কাজ হয় আফগানিস্তান থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়া বেশীরভাগ সদস্য ও নেতারা পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান সিন্ধ পাঞ্জাবে আশ্রয় নেয় কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ সেখান থেকে ইরানে যেয়ে সেখানকার সরকারের সাথে সহাবস্থান করে

যতটুকু সম্ভব কার্যক্রম পরিচালনা করে। যদিও ইরান তাদের আশ্রয় দিয়েছিল আমেরিকান বাহিনী থেকে নিস্তার পওয়ার জন্য। কিন্তু আল কায়েদার সাথে ইরানের সম্পর্ক কখনই স্থিতিশীল ছিল না।

তার পরের স্টেজ ছিল আল কায়েদার পাকিস্তানে কার্যক্রম। খালিদ শাইখ মোহাম্মদ ৯/১১ এর পরের আন্তর্জাতিক অপারেশনের দায়িত্ব নেয়। পাকিস্তানের করাচি সহ নানা জায়গায় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। কিন্তু পাকিস্তান ও আমেরিকান হামলার কারণে সেখানেও অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আল কায়েদার প্রতি ৯/১১ পরবর্তী নজিরবিহীন আগ্রাসনের পরেও তাদের টিকে থাকা ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা তাদের দলের বৈশিষ্টকে স্পষ্ট করে তোলে। যে কোন সমস্যাকে নির্দিষ্ট করে তার সমাধানে খুবই তৎপর থাকে তারা যেমন এই সময় তারা লক্ষ্য করেছে যেইসব নেতারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তাদেরকেই টার্গেট করা হয় ফলে তারা মোবাইল ব্যবহার ছেড়ে দিল, ব্যক্তিগত বার্তাবাহক, রেডিও, ডেড ড্রপ ইমেইল ইত্যাদি পদ্ধতি খুব তাড়াতাড়ি তারা গ্রহন করল। কিন্তু এই কাজ মূল্য ছাড়া হয় নাই কাজের গতি কমে যাওয়া নেটওয়ার্কে বিস্তৃতি ধীর হয়ে যাওয়া ও দলের মধ্যে অনেক তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার মত ছাড় আল কায়েদাকে দিতে হয়েছিল। কিন্তু দক্ষতা ও নিরাপত্তা এই দুইটির একটি বেছে নেয়া সব সময় জিহাদী দলগুলোর করতে হয়েছে আজও হচ্ছে।

আল কায়েদার জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনও মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ৯/১১ এর পরের সময়ে পাকিস্তানের গোত্রীয় পাহাড়ি অঞ্চল নিজেদের জন্য আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছিল। সাথে সাথে অই এলাকার বাসিন্দারা আরব মুহাজির দের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি ছিল। ফলে পাকিস্তান আর্মির নির্লিপ্ততায় আল কায়দা একটি শক্ত অবস্থান পাকিস্তানে গড়ে তোলে। এর সাথে সাথে আমেরিকার কিছু ভুল পলিসিও আল কায়েদার এই টিকে থাকার পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে যেমন যখনই আল কায়েদার নেতাদের ধরার জন্য উপযুক্ত শক্তি তারা অর্জন করেছিল তখনই তাদের এই ক্ষমতা ইরাকের দিকে স্থানান্তর করা শুরু করেছিল যা আল কায়েদার উপর আঘাত হানার সক্ষমতা ও দক্ষতা কমিয়ে দেয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে তারা আল কায়েদার সিনিয়র নেতাদের ধরার ফলে দলের উপরে এর প্রভাব অনেক বাড়িয়ে চিন্তা করেছিল। যেমন তারা কখনোই ভাবে নি ওসামা বিন লাদেন রহঃ বা খালিদ শাইখ মোহাম্মদ ফাঃ আঃ

এর মত নেতাদের অভাব আল কায়েদা পূরণ করতে পারবে। আল কায়েদা সম্পর্কে বর্তমানে আরেকটি থিউরি প্রচলিত আছে যে আল কায়েদা একটি নেতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংগঠন থেকে ধ্বংস হয়ে এখন শুধু বিশ্বের নানা প্রান্তের জিহাদীদের আন্তিক ও আদর্শিক নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই মতের মানে হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে জিহাদীদের নেতৃত্ব দেয়ার মত এখন আর কেউ নেই আর এটি ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের কাছে জনপ্রিয় ছিল।

কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা ৯/১১ এর পরবর্তী আন্তর্জাতিক আক্রমণ গুলোর দিকে ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, ২০০২ সালের বালি বম্বিং, একি বছরে মোম্বাসা ইস্রায়েলি হোটেল ও এয়ারলাইনে হামলা, ২০০৩ সালে টার্কিতে কয়েকটি হামলা ও ২০০৪ সালের রিয়াদ ও মাদ্রিদ বোম্বিং সব জায়গায় আল কায়েদার অপারেটিভ দের নেতৃত্ব স্পষ্ট। আবোটাবাদ থেকে পাওয়া ডকুমেন্টসেও এই কথা স্পষ্ট যে ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় সব বড় বড় হামলার জন্য আল কায়েদা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী যদিও হামলা হওয়ার মাস অনেক সময় বছর পার হলেও এতে আল কায়েদার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা যায় নাই। ২০০৫ সালের লন্ডন মাস ট্রানজিট সিস্টেমে হামলার ঘটনাও এমন যেখানে পুলিশদের থেকে আল কায়েদা কোন সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ হয় নি কিন্তু আল কায়েদা থেকে বের হওয়া ভিডিওতে আইমান আল জাওয়াহিরি হাফি এর বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়।

.... চলবে ইনশাআল্লাহ

হাডসন ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আল কায়েদার উপর জার্নাল - ৪র্থ ও শেষ পর্ব

আন্তর্জাতিক সংস্থাঃ

৭/৭ এর আক্রমনের পরেও আল কায়েদার শুধুই আদর্শিক মতবাদ থেকে অনেক বিশেষজ্ঞ বের হতে পারে নি। এ বিশ্লেষণ আরো জোরদার হয় আমেরিকার ইরাক আক্রমণ ও একিউআই আল কায়েদা ইন ইরাক তৈরী মাধ্যমে। ইরাকের আমীর আবু মুসআব আল যারকাউয়ি রহঃ এর সাথে আল কায়েদার সম্পর্ক অনেক পুরোন ও শক্ত হওয়ায় খুব সহজে আল কায়েদা ইরাকে প্রভাব বিস্তার করে এর সাথে সাথে ইরাক আক্রমনের ফলের নতুন জিহাদি রিক্রুটের ঢল নামে যা আল কায়েদার এই অবস্থা পরিবর্তনে খুব সহযোগিতা করে। যদিও অনেক আল কায়েদা সিনিয়র নেতাদের যারকাউয়ি এর সম্পর্কে দোটানায় ছিল তার হেদায়েতের আগের জীবন ও নিয়মতান্ত্রিক ইসলামের জ্ঞান অর্জন না করার জন্য, কিন্তু যখন আল কায়েদা তার গড়া ইরাকের শক্ত ভিত্তি পেয়ে গেল তখন তা উপেক্ষা করেই সৃষ্টি হল একিউআই। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আল কায়েদা তার এই ভয়ের সত্যতা প্রকাশ পেল রক্তপাতের প্রতি প্রবল আগ্রহ, ইরাকে অন্যান্য জিহাদী দলগুলোর সাথে বৈরী সম্পর্ক ও নির্বচারে শিয়াদের হত্যার কারণে তারা আল কায়েদার সামগ্রিক লক্ষ্য থেকে তার কার্যকলাপ বিচ্যুত হয়ে পড়ে একিউআই। মুসলিমদের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া পরবে এই কথা মাথায় রেখে তাকে আল কায়েদার পক্ষ থেকে কমপক্ষে দুইটি চিঠি পাঠানো হয়। আইমান আল জাওয়াহিরি তাকে পাব্লিক সাপোর্ট বাড়ানো ও মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত করতে নিষেধ করেন ও প্রয়োজন ছাড়া শিয়াদের সাথে সংঘাতে না যেতে বলেন। তিনি বলেন যে জিহাদিরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অস্ত্র যেটা ব্যবহার করে তা হচ্ছে সাধারণ জনগণের সহায়তা তাই এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত যা সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও বুঝের বাইরে। ঠিক এর পরের বছর আতিয়াহ আব্দ আর রাহমান রহঃ আরো কঠোর ভাষায় তাকে সাবধান করেন তিনি বলেন রাজনৈতিক ফায়দা সামরিক ফায়দা থেকে বেশী প্রয়োজন। তিনি সাধারণ জনগনের ছোটখাট ভুল উপেক্ষা করতে বলেন ও তাদের সাথে এমন আচরণ করতে না করেন যার ফলে তারা তাদের বিপক্ষে যেয়ে শত্রুদের সাথে যোগ দেয়। এছাড়াও তিনি তাকে গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আল কায়েদার সিনিয়র নেতাদের সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নেয়ারও নিন্দা জানান। আবু মুসআব

আল যারকাউয়ি ও একিউআই এর সাথে আল কায়েদার এই টানা পোড়নে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আচ পাওয়া যায়, যার ফলে আল কায়েদা নতুন নতুন দলের সাথে যুক্ত হতে পারছে নতুন এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে নিজেদের সংগঠনের বিস্তৃতি বাড়ছে একি সাথে দলের ঐক্য নিজেদের নেতৃত্ব প্রয়োগ ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সময় আল কায়েদা আরেকটি নতুন সমস্যার মধ্যে পড়ে তা হচ্ছে নিজের শাখা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা। কিছুদিন আগেও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যেই সমস্ত নেতাদের অবস্থান ছিল ফলে যখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাচ্ছিল না পত্রবাহক দিয়ে এই কাজ করা যেত কিন্তু যখন ইরাকের সাথে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে এই কাজ সহজ ছিল না। প্রায় সময় পত্র বাহক আটক হত নিজেদের প্ল্যান তাগুত বাহিনির নজরে চলে আসত। এই সময় পত্র বাহক থেকে দূত এর মাধ্যমে যোগাযোগ কিছুটা রক্ষা করা যেত তাও সেটার ফলাফল খুবই স্বল্প ছিল। এর ফলে প্রায়ই আল কায়েদার তার শাখা সংগঠনের নিয়ন্ত্রন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যেত। এবং যেই যেই সংগঠন আল কায়েদার বিভিন্ন কমান্ড মানতে নারাজ ছিল তাদের জন্য এটা ছিল একটি অযুহাত যদিও অনেকের কাছেই বাস্তবিক পক্ষেই নির্দেশ বা নতুন দলীয় নীতি পৌছাত না ফলে না জানার কারণেও অনেক সময় দলের স্বার্থে আঘাত করবে এমন কাজ নিজের দলের লোক দিয়ে সংগঠিত হত। যদিও ওসামা বিন লাদেন রহঃ প্রায় সময়ই শাখা সংগঠনের আমীর বা গুরুত্বপূর্ন অপারেশনের লোক নিজে বাছাই করতেন কিন্তু অনেক সময় তা হয়ে উঠত না। আল কায়েদার নেটওয়ার্ক বাড়ার সাথে সাথে নানা এলাকার নানা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের লোক আল কায়েদার অধীনে একত্রিত হয়। এর মধ্যে অনেকেরই নিজেদের স্থানীয় লক্ষ্য এর সাথে দলের লক্ষ্য এক থাকত না অনেক সময় ক্রম নির্বাচনে এলাকার সমস্যা আগে থাকত । এই সব ঘটনা থেকে দলকে মুক্ত রাখার জন্য সেই সব শাখার সাপোর্ট বা ফান্ডিং বন্ধের মত একশন নিতে হয়েছিল কিন্তু বিকল্প ফান্ডিং পেলে অনেক সময় অনেকে নিজেদের আল কায়েদার সমকক্ষ অনেক সময় উচ্য মর্যাদার ভাবতেও শুরু করত। একি সময়ে কিছু কিছু শাখা সংগঠনের নিজেদের মিডিয়া আউটলেট খুলে ফেলল ফলে আল কায়েদার কন্ট্রোল সবার উপরে বজায় রাখা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

২০০৪ এর পরে থেকে বেশীরভাগ এনালিস্টদের এই বিশ্বাস আসে যে আল কায়েদা একটি বিক্ষিপ্ত সংগঠনে রুপ নিয়েছে। অনেকে ইরাকে এর সাথে তাদের

সম্পর্ক নিজেদের টিকিয়ে রাখার শেষ চেস্টা হিসেবে দেখেছে। অনেকে এমন মন্তব্যও করেছে যে যারকাউয়ি ওসামা বিন লাদেন কেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু ইরাকের সাথে এই মৈত্রী এককভাবে আল কায়েদার দুর্বলতা ভাবা যায় নি কারণ ইরাকের একটি শক্তিশালী দলেরও আল কায়েদাকে নিজেদের সাথে যুক্ত করার প্রবণতা ছিল শেষে দেখা যায় সম্পূর্ন লাভ একিউআই এরই হয়েছে উলটো দিকে আল কায়েদার নিজেদের নেতৃত্বের দূর্বলতা মানুষের কাছে প্রচার হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানের কারণেই অন্য ভুখন্ডেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল যদিও তা অনেক কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। একি ভাবে aqim (২০০৭) ও aqip (২০০৯) এর সাথে নিজেদের আনুষ্ঠানিক সংযুক্তিও অনেকে এই ভাবেই দেখেছে। ২০১১ সালে ওসামা বিন লাদেন রহঃ এর শাহাদাত বরনের পর সবাই প্রায় এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে আল কায়েদার তার শাখা গুলোর উপর কোন প্রভাব অবশিষ্ট নেই। ২০১১ সালের অগাস্ট মাসে নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে এই নামে একটি আর্টিক্যাল ও প্রকাশ পেয়েছিল।

বাস্তব চিত্র অনুধাবন করলে দেখা যায় যে নির্দেশনার কেন্দ্রীকরণ ও কার্যকরণের বিকেন্দ্রীকরণ যেই দলের মূল বৈশিষ্ট তাদের জন্য শাখা সংগঠনের বৃদ্ধি তাদের ক্রমেই শক্তিশালী করবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় নেতাদের কাজ মূল লক্ষ্য নির্ধারন আমির নির্বাচন ও ক্ষেত্রে বিশেষে গুরুত্বপূর্ন অপারেশনের লোক নির্বাচন। যেহেতু স্থানীয় আমীরদের হাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল তারা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে পারত। আর যেহেতু আমীর নির্বাচন কেন্দ্রীয় নেতাদের হাতে ছিল ফলে তাদের বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। এছাড়া এই নীতির ফলে সেন্ট্রালের সাথে স্থানীয় শাখার যোগাযোগও কম প্রয়োজন হয়।

যদিও আল কায়েদা প্রায় সব শাখার উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সমর্থ হয় কিন্তু একিউআই এর সাথে পুরোনা ঝামেলার নিস্পত্তি হয় না এবং তাদের মধ্যে পুরাপুরি বিচ্ছেদ হয় আইএসআইএস সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু এই রকম বিদ্রোহ বা দলছুট হওয়ার ঘটনা কেন খুবই কম তা জানার জন্য এবোটাবাদ থেকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্রের সাহায্য নিতে হবে। সেখানে উল্লেখ আছে যে আল কায়েদার সিনিয়র নেতারাও বিভিন্ন শাখা দলের সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন যা থেকে নিজেদের প্রভাব তার শাখা এর উপর স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। এর কিছু কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলঃ

১। মে ২০১০ এ ওসামা বিন লাদেন রহঃ নির্দেশ দেন আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক হামলার শাখা খোলার জন্য যার দায়িত্ব থাকবে আব্দুল মালেক ড্রোউকদেল যা শুধু আমেরিকা ও পশ্চিমা স্থাপনায় আঘাত করবে। আল শাবাবের দায়িত্ব থাকবে আফ্রিকার শিং এর উপরে আর বাকি আফ্রিকার থাকবে ইউনিস আল মৌরিতানি এর হাতে।

২। তিনি সব শাখা সংগঠনকে আল কায়েদার সাথে করা চুক্তির সম্মান করতে বলেন ফলে পাকিস্তানের আইএসআই , পাঞ্জাবের গভর্নর নেওয়াজ শরীফের ভাই, ইরান, তুরস্ক, মৌরিতানিয়া এইসব দেশ ও দলের সাথে চুক্তি সবাই মেনে নেয়। তামিম আল আদনানি যে আইএসের মুখপাত্র ছিল সেও স্বীকার করেছে যে তারা আল কায়েদা থেকে ভেঙ্গে যাওয়ার আগে ইরানে আক্রমণ করে নি।

৩। এছাড়াও আল কায়েদার যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সেই শাখা ছাড়াও অন্য শাখার সিনিয়র নেতাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দিত যার প্রভাব আজ পর্যন্ত আমরা সিরিয়ার হায়াতুত তাহরীর আশশামের সাথে ঘটনায় দেখি।

৪। তিনি অনেক সময় দলের ক্ষুদ্র বিষয়েও নির্দেশনা দিতেন যেমন পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান থেকে মুজাহিদদের বের করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আতিয়াহ আবদ আর রাহমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫। নেতৃত্বের অসাধারণ গুনের প্রকাশ করেছেন তিনি যখন একিউএপি এর আমির নাসির আল ওহাইশি নিজে থেকে সরে গিয়ে আনোয়ার আল আওলাকি রহঃ কে আমীর বানানোর প্রস্তাব দেন। তিনি আগে আনোয়ার আল আওলাকি রহঃ এর বায়োডাটা ও তার গুনের বর্ননা ও তাকে আমীর বানানোর কারণ জানতে চান।

আল কায়েদার সাথে একিউআই এর সম্পর্ক সম্পর্কে আরেকটু ভাল ভাবে জানা যায় এবোটাবাদ থেকে পাওয়া ফাইল পত্রের মধ্যে। যদিও আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ ও আতিয়াহ আবদ আর রাহমান রহঃ থেকে একিউআই এর প্রতি সতর্ক বার্তা দেখে অনেকেই মনে করেছিল যে তখন আল কায়েদা তার এই শাখা উপর খুবই কম বা কোন নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি তামিম আল আদনানি এই কথা স্বীকার করেছে যে তারা ওসামা বিন লাদেনের ২০০৭ এর বক্তব্য অনুযায়ী ইরানের উপর হামলা বন্ধ রেখেছিল। এছাড়াও আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ কে তৎকালীন আইএসআই

(একিউআই এর পরবর্তী নাম) কে তার বক্তব্যে তাদের সাথে আল কায়েদার সম্পর্ক স্পষ্ট করতে বলেন ও তাদের পক্ষে কথা বলতে বলেন। আরেকটি প্রাপকের নাম উল্লেখ ছাড়া চিঠিতে ওসামা বিন লাদেন রহঃ আইএসআই এর আমীরের শাহাদাত বরনের কথা উল্লেখ করে এই নির্দেশ দেন যেন তারা একটি সাময়িক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতাদের আমীর নির্বাচন করার আগ পর্যন্ত। যদিও আল কায়েদার তার ইরাকি শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছিল এর সাথে যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুবিধাও ছিল না তারপরেও ওসামা বিন লাদেন হাফিঃ এর কাছে শেষ পর্যন্তও তাদের আমীর ঠিক করার মত ক্ষমতা ছিল। ২০১৩ সালে আবু বকর আল বাগদাদী যখন আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ এর সিরিয়া প্রবেশ এর নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ন উপেক্ষা করল তখনই আল কায়েদার সাথে তার ইরাকি শাখার সম্পর্ক পুরাপুরি ধ্বংস হল।

এবোটাবাদ থেকে আল কায়েদার সাথে শাবাবের সম্পর্কের চিত্রও উঠে এসেছে। যদিও প্রথমে আল শাবাবের দূর্বল শাসন ব্যবস্থা হুদুদ এর প্রয়োগ না থাকা ইত্যাদি বিষয়ে ওসামা বিন লাদেন হাফিঃ চিন্তিত ছিলেন কিন্তু শাবাবের আমীর আহমেদ আবদি গোদান রহঃ এর কাছে উনার চিঠিতে আল শাবাবকে আল কায়েদার সাথেই রাখেন যাতে আল শাবাব আল কায়েদার ফান্ডিং অব্যাহত রাখে যদিও আল কায়েদার প্রথমে কোন ইচ্ছা ছিল না আল শাবাবকে তার শাখায় অনর্ভূক্ত করার। এছাড়াও আরেক চিঠিতে শাবাবের বায়াহ গ্রহন করার প্রমাণ আছে। মৌরিতানিয়া এর চুক্তি এর ব্যাপারে আল শাবাব আমীরের মতামত ও নেয়া হয়েছিল যা শুধু গুরুত্বপূর্ন নেতা ও শাখা আমীরদের জন্য খাস ছিল। এছাড়াও সেখানে একিউআইএম এর সাথে আল শাবাবকে এক সাথে অই এলাকার অন্য জিহাদী দলগুলোকে আল কায়েদার সাথে যুক্ত করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। আল শাবাবের সাথে আল কায়েদার এই সম্পর্ক গোপন রাখার মূল কারণ ছিল যাতে আমেরিকান ও কাউন্টার টেরোরিস্ট গ্রুপের নজরদারি ছাড়াই আল শাবাব তার নেটোয়ার্ক বড় করতে পারে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

আল কায়েদার গোপনে নেটওয়ার্ক বাড়ানোর কৌশলঃ

আল শাবাবের সাথে এই গোপন সম্পর্ক কৌশল আল কায়েদা আরব বসন্তের পরেই গ্রহন করে, যখন মিশর তিউনিসিয়া লিবিয়াতে স্বৈরাচারী শাসকের পতন হয় আল কায়েদা সেখানে প্রবেশ করার এক মোক্ষম যুযোগ লাভ করে যা আগের অবস্থায় সম্ভব ছিল না। তাই আল শাবাবকে আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক গোপন রেখে সেখানে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে বলে এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক কাফের শক্তির বিশেষ নজর এর বাইরে রাখে। তার লক্ষ্য ছিল এমন যে আল শাবাব অই সব দেশে নিজেদের নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে ও সাধারণ জনগণের বোঝার মধ্যে থেকেই তাদের কাজ করবে যেহেতু আল কায়েদা সম্পর্কে অল্রেডী আমেরিকার প্রোপাগান্ডা সাধারণ মানুষের মনে খারাপ ধারনা তৈরী করেছে তাই তারা নিজেদের স্বার্থেই এই কৌশলের আশ্রয় নেয়। ঠিক একি রকম গোপন শাখা সংগঠনের মধ্য ছিল তিউনিসিয়ার আনসার আল শরিয়া পূর্ব লিবিয়ার আনসার আল শারীয়াহ, সিরিয়ার জাহবাত আল নুসরা ।

২০১৩ সালের আবু মহাম্মদ জুলানিকে তিরস্কার করে একটি চিঠিও লেখেন যে কেন সে আল কায়েদার সাথে তার সম্পর্ক পাবলিক করল কেন্দ্রীয় অনুমতি ছাড়া। বাকি দুই দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের ব্যাপক অপারেশনের ফলে তাদের সাথে আল কায়েদার সম্পর্কের চিত্র তাদের কাছে আসে। আরব বসন্তের পর পর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এই গোপন শাখাদের আল কায়েদার সাথে যুক্ত করতে দোটানায় ভুগছিল তারা ভাবত যে এরা স্থানীয় জিহাদি দল আল কায়েদার আদর্শে উদবুদ্ধ কিন্তু এর সাথে কোন কেন্দ্রীয় নেতার যোগাযোগ নেই। তাদের এই ভুল ধারণার পিছনে প্রথমে আল কায়েদার তার গোপনীয়তা রক্ষা করার দক্ষতাই দায়ী ছিল। দ্বিতীয়ত বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিল যে যেহেতু আরব বসন্তে কোন রক্তপাত ছাড়াই স্বৈরশাসকদের পতন হয়েছে তাই মুসলিম বিশ্বে আল কায়েদার শাসক উৎখাতের রক্ত ঝরানোর নীতি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এছাড়া ঠিক তখনই ওসামা বিন লাদেন রহঃ এর শাহাদাত বরণে তারা ভেবেছিল আল কায়েদার সাথে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু এই উচ্চাশার কারণে তারা আল কায়েদার এই গোপন অগ্রসর অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আরব বসন্ত এর পরের এই সময়ে তারা খুব সুচারু ভাবে এই সুযোগের সতব্যবহার করেছে। তৃতীয়ত আল কায়েদার বৈশ্বিক নীতি বুঝতে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়া। তারা ভাবত যে আল কায়েদা শুধু দূরের টার্গেট যেমন আমেরিকা বা ন্যাটো

এইসব দিকে তার সব মনোযোগ দেয়। আর অপর দিকে আনসার আশ শারিয়াহ শুধু স্থানীয় অপারেশন চালাচ্ছিল যা তাদের বুঝ অনুযায়ী আল কায়েদার দলীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন না। এছাড়াও বারাক ওবামার এক বক্তব্যও এই ভুলের পিছনে দায়ি ছিল যেখানে সে বলেছিল যে আরব বসন্তের এই যুগ কিছু স্থানীয় উগ্র লোকদের দ্বারা হচ্ছে যারা শুধু এলাকা দখল করতে চায়।

আল কায়েদার প্রতি অস্বচ্ছ ধারণা আজও চলমান আছে। এই ২০১৬ সালেও অনেক বিশেষজ্ঞ এই মতামত দিয়েছে যে আল কায়েদার শক্তি ক্রমশ নিম্নমুখী কারণ তাদের শাখা গুলো দলের আগের এজেন্ডা আমেরিকা বা পশ্চিমা লক্ষ্য বাদ দিয়ে এলাকার টার্গেটের দিকে বেশী নজর দিচ্ছে ও আল কায়েদা তার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। কিন্তু তারা আরব বসন্তের সাথে পশ্চিমা টার্গেটের প্রতি আগ্রহের হিসেব খুব আনাড়িভাবে করেছে। আল কায়েদা মুলত এই দূরের শক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু করেছিল কারণ তারা ভাবত যে আমেরিকার সাপোর্ট ছাড়া এলাকা এই পুতুল সরকার আল কায়েদার বিপক্ষে টিকে থাকতে পারবেনা কিন্তু আরব বসন্ত তাদের এই হিসাব নতুন করে করতে শিখায় যখন তারা দেখল তারা যেই সরকারকে জিহাদ করে সরাতে চাচ্ছে সেই একি শাসক গাদ্দাফিকে আমেরিকা নিজে সরিয়ে দেয় অপর দিকে মিশরের হোসনি মোবারকে পতনে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ হয় না। ফলে এই আরব বসন্তের পরে আমেরিকাকে প্রথম টার্গেট হিসেবে রাখার নীতি থেকে আল কায়েদা সরে আসে এবং এলাকার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

উপসংহারঃ

আল কায়েদার এই নতূন সম্ভাবনার ক্ষেত্র অবশ্যই নতুন কিছু সমস্যা নিয়ে এসেছে। যেমন আল কায়েদার সাথে আইএসআই এর বিচ্ছেদ ও আইএসআইএসের অভাবনীয় উথ্যান। কিন্তু এখানেও আল কায়েদা তার টিকে থাকার দক্ষতার চরম নৈপুণ্য প্রকাশ করেছে। নতুন সময়ে হাইয়াত তাহরীর আশ শামের সাথে এই সমস্যাকেও অনেকে সিনিয়র নেতাদের সাথে আল কায়েদার মাঠ পর্যায়ে কাজ করা দলের দূরত্ব হিসেবে দেখছে। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট হয়েছে যে আল কায়েদা বা জিহাদী দলের কার্যক্রম এর উপর সাথে সাথে দেয়া বিশ্লেষণ থেকে খুব একটা বোঝা যায় না, বরং তাদের সুচারু সুনিপন সুদূরপ্রসারী প্ল্যান যত দিন যায় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

যদি শাখা সংগঠনের বিদ্রোহ বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে অন্য শাখাদের মধে কেন্দ্রীয় প্রভাব কমে যাবে এছাড়াও যেসব শাখা অন্য শাখার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছে তাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে না। এখন শুধু সময়ই বলে দিবে যে আল কায়েদা হাইয়াত তাহরীর আশ শামের এই নতুন চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করে।

পরিশেষে এই প্রশ্ন আসে যে জিহাদি দলগুলোর পরবর্তী আচরণ কেমন হবে? এটা মনে রাখতে হবে যে জিহাদী দল মজ্জাগত ভাবে চোরাগোপ্তা গেরিলা দল এর উপর আল কায়েদা তার উপরে আসা অনেক রকমের পরীক্ষায় অস্বাভাবিক সফলতা দেখিয়েছে। তাই আমাদের আল কায়েদার সাংগঠনিক কাজ ভাল করে বুঝতে হবে তার দূর্বলতা চিনতে হবে এর জন্য সবার একযোগে কাজ করতে হবে।

এই লেখার যা কিছু কল্যাণকর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভুল ত্রুটি সবই আমার কমতি। দয়া করে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ও এই আলাহর বান্দার জন্য খাস দুয়া করবেন। ওয়া আসসালাম।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০১৪২

তাওহীদ এবং জিহাদের মধ্যে সম্পর্ক ও আমাদের বুঝ

পুস্তক সংক্ষেপঃ (তাওহীদ আল 'আমালী), শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম

Abdul Muqaddim

Junior Member

০৯-১৮-২০১৮

তাওহীদ আল-'আমালী

শহীদ শাইখুল মুজাহিদীন ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম (রহিঃ)

১। পুস্তক পরিচিতিঃ

"তাওহীদ আল-'আমালী" প্রকৃতপক্ষে শহীদ শাইখুল মুজাহিদীন, ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম (রহিঃ) কর্তৃক প্রদানকৃত একটি খুতবার অংশ বিশেষ।

২। লেখক পরিচিতিঃ

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামকে (১৯৪১-১৯৮৯ খ্রীঃ) বলা হয় বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশ্বব্যাপী জিহাদ উত্থানের বাস্তব-গুরু। জীবন পরিক্রমায় প্যালেস্টাইনের জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে বিতশ্রদ্ধ হয়ে, জর্ডান, মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি, সৌদি-আরব ও পাকিস্তান পেরিয়ে পরিশেষে নিজেকে যখন সোভিয়েত- আফগান যুদ্ধের ময়দানে (১৯৭৯-১৯৮৯ খ্রিঃ) আবিষ্কার করলেন, তিনি উতফুল্ল চিত্তে উচ্চারণ করলেন 'এটাইতো প্রকৃত জিহাদ'। তার লিখিত সেই ঐতিহাসিক ফাতওয়া- "ফাতওয়াঃ আলিমগণের দ্বারা ইসলামের কোন বিষয়ে রায় প্রদান করা" যা তৎকালীন শাইখ বিন বাজ সহ, বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল মাযহাবের বহু আলেম-উলামা কর্তৃক বিপুলভাবে সমর্থন লাভ করে।[১] জিহাদের ফারজিয়াতকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে পুনঃপ্রাসংগিক করে তুলেছিল।[২]

[১] মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা, শাইখ আবুল্লাহ আযযাম, পৃষ্ঠা ১৫,
[২] মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা, শাইখ আবুল্লাহ আযযাম, পৃষ্ঠা ১১,

৩। পুস্তক এর শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

ক। তাওহীদ তিন ধরনের, যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ৩য়টি হল সকল তাওহীদ অর্জনের মূলঃ

(১) তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ (রব হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদ),

(২) তাওহীদুল আসমা অস সিফাত (আল্লাহর নাম গুণাবলীতে একত্ববাদ)

(৩)তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ (ইবাদাতে মাবুদ হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদ) তাওহীদুল ইবাদাহ।

খ। যুগে যুগে নবী বা রাসুলগণকে প্রেরণই করা হয়েছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর জন্যে।[৩] প্রথম দুইটি তথা তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ ও আসমা য়ুস সিফাত হল ঈমানের তাত্বিক দিক, যা কেবল পরিষ্কারভাবে জানা ও মনে মনে যথাযথ ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করাই কর্তব্য।

গ। এখন এই তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ কিভাবে অর্জন হবে? যেমনটি 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিখিয়েছেন যে, কোন বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হবার নয়। বরং, এটি প্রতিষ্ঠিত হবে আত্নশুদ্ধির মাধ্যমে, জিহাদের ময়দানে কাফিরদের মোকাবেলার মাধ্যমে, তাগুতের মুখোমুখি হয়ে অত্যাচার সহ্য করার মাধ্যমে ও সর্বোপরী নফসের কুরবানীর মাধ্যমে'।[৪]

ঘ। অর্থাৎ, 'জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত একজন মানুষের অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না'।[৫] কেন? "একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার জীবন। যখন, এই জীবন আপনার হাতের তালুতে রাখবেন-দিনে এবং রাতে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করবেন যেন আল্লাহ তা গ্রহণ করে আপনাকে পবিত্র করে এবং আপনি দুঃখিত হবেন যদি বিশ্ব জগতের রব তা গ্রহণ না করে, তখন কিভাবে আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবেন? যে প্রতিদিন মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হয়, সে কি কোন কিছুকে ভয়

[৩] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ৭
[৪] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ৫,
[৫] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) , পৃষ্ঠা নং ৫

পেতে পারে আল্লাহ ছাড়া? সুতরাং তাওহীদ অন্তরে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে শিকড় গাড়তে পারে না- জিহাদ করা ব্যাতীত।

৬। দ্বীনের সত্যিকারের বুঝ অন্তরে ধারন করতে হলেও আপনাকে জিহাদে যোগদান করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, ".....তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়, যাতে তারা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে পারে আর প্রত্যাবর্তন করে নিজ কওমের লোকদের ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যেন তারা পরহেয করে চলে" (সুরা তওবাঃ১২২)[৬]

ইবনে আব্বাস (রাঃ), আত-তাবারী এবং সাইয়্যেদ কুতুব (রঃ) বর্নণা করেছেন যে, যেই দলটি আল্লাহ'র পথে জিহাদে বের হয় তারাই দ্বীনের বুঝ অর্জন করতে পারবে...তারাই দ্বীনের লুক্কায়িত সৌন্দর্য বুঝতে পারবে এবং দ্বীন তার আভ্যন্তরীণ মুক্তা তাদের নিকট প্রকাশ করে দিবে।[৭]

সাইয়্যেদ কুতুব আরো বলেছেনঃ " নিশ্চই, এই দ্বীন একজন ফক্বীহ'র নিকট এর সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, যে, ঠান্ডা আলোচনায় বসে অথচ এই দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করে না ..."।

হ্যাঁ...এই দ্বীন...আপনি এর সঠিক বুঝ পেতে পারেন না যদি না আপনি এর জন্য আত্নত্যাগ করেন। যখন এই দ্বীনের জন্য আপনি কিছু (আত্নত্যাগ স্বীকার) করবেন তখন এই দ্বীন আপনাকে দিবে (এর সঠিক বুঝ)... "দেওয়া ও নেওয়া রীতি"। অত্নত্যাগ! তখনই বিশ্বজগতের রব আপনার জন্য দরজা উম্মুক্ত করে দিবেন... এই দ্বীনের জন্য আত্নত্যাগ করুন তখনি আল্লাহ আপনাকে তাঁর আয়াত ও হাদিস শিক্ষা দিবেন। একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, আপনি জিহাদ ব্যাতিত কুরআনের অনেক আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন না।

উদাহরণ স্বরুপঃ সুরা আততাওবাহ, সুরা আল-আনফাল, সুরা আল-ইমরান ...কিভাবে আপনি উক্ত সুরাসমূহ বুঝতে পারবেন জিহাদের জন্য চেষ্টা সাধনা ব্যাতীত? এটি কখনই সম্ভব নয়।

---

[৬] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ১১, সুরা তওবাঃ১২২ ও এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

[৭] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ১১, প্যারা ৫ দ্রষ্টব্য

চ। আত্মার পরিশুদ্ধি। জিহাদের মাধ্যমে প্রথম যে লাভ অর্জিত হয় তা হচ্ছেঃ মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি। আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে এর মধ্যে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ অর্থাৎ, তাওহীদুল উবুদিয়্যাহ তথা তাওহীদুল 'আমালী প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন বান্দার আচরণ এমন হয় যেন সে তার রবকে দেখছে এবং রব তার অতি নিকটেই আছে (আল্লাহ আল –ক্বারিব)।

ছ। আল্লাহর মু'জিযা স্বচক্ষে দেখতে হলে, আপনাকে জিহাদ করতে হবে। আকলমানদের জন্যে শাইখ আযযাম তার বইতে কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরেছেনঃ

(১) "আরসালান শহরে যুদ্ধের এক পর্যায়ে কিছু মুজাহিদীনকে রাশিয়ান ট্যাঙ্ক চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। ওরা চেয়েছিল জীবিত ধরতে। মুজাহিদীনদের পালাবার আর কোন পথ ছিলনা। অতঃপর তারা দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ, একজন কাফিরকেও আমাদের উপর ক্ষমতা দিও না"। হঠাৎ ট্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে বিকট শব্দ শোনা গেল। সমস্ত রাশিয়ান বাহিনী পলায়ন করল, অথচ ওদেরকে লক্ষ্য করে কোন গুলি ছোড়া হয়নি! এরপরও মুজাহিদীনরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে না কেন"?[৮]

(২) "একবার রাশিয়ান প্লেন মুজাহিদদের উপর বম্বিং করতে শুরু করল। মোঃ উমর নামে একজন তার ফিতরাত অনুযায়ী দুই হাত তুলে প্লেনটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আমার রব! কে বড়? আপনি, নাকি প্লেনটি? কে বেশী শক্তিশালী? আপনি? নাকি এই প্লেনটি? আপনি কি আপনার এই বান্দাদেরকে প্লেনগুলীর থাবার মধ্যে ছেড়ে দেবেন?' ...পরের সংবাদ, কাবুল রেডিও ষ্টেশন থেকে প্রচার করা হল, সেই প্লেনটি ভূপাতিত হয়েছে এবং এর মধ্যে একজন রাশিয়ান জেনারেল ছিল..."[৯]

জ। মৃত্যু আল্লাহ'রই খাস ইচ্ছায় হয়। পারিপার্শ্বিক কোন কারণ মৃত্যুর জন্য কেবল আল্লাহরই মনোনীত উসিলা মাত্র, এর প্রকৃত কারণ নয়। শাইখ তামিম একবার প্রবল গুলি বর্ষণের মধ্যে থেকেও অক্ষত ফিরে এসে তার সেই অভিজ্ঞতা থেকে[১০] বললেন, " সেই দিন থেকে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, বিশ্বজাহানের রব

[৮] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ৮, ১ম প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য
[৯] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ৮, ১ম প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য
[১০] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ৮ ও ৯ এর বর্নণা দ্রষ্টব্য

আল্লাহ'র নির্ধারিত মুহূর্ত ব্যতীত কেউই মারা যাতে পারে না এবং খুব কঠিন ঝুঁকি নিলেও মৃত্যু মুহূর্ত পরিমাণ কাছে চলে আসে না, আর, নিরাপদ জায়াগায় থাকলেও মৃত্যু মুহূর্ত পরিমাণ দূরে চলে যায় না"।

৪। বাস্তবক্ষেত্রে তাওহীদ আল 'আমালী'র প্রয়োগ/ সংযোগ/ কিংবা করনীয়ঃ

জিহাদের সাথে তাওহীদের এই সম্পৃক্তি, বা স্বয়ং আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সাঃ) কর্তৃক তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় জিহাদের তাগিদ সংক্রান্ত আলোচনার প্রভুত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের অনেকেরই, তাওহীদ ও জিহাদের মধ্যে 'সম্পর্ক' সংক্রান্ত কোন জ্ঞানই নেই। ফলে তারা, তাদের অস্তিত্বের মূল্য যেমন বোঝেন না, আর না বোঝেন তাদের করনীয়ই বা কি। এমন অনেকেই আছেন, যারা না বুঝে, না জেনেই আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সমালোচনা করেন, অনেক সময় কুফফারদের সুরে সুর মিলিয়ে 'জংগি' (Terrorist) বলতেও দ্বিধা করেন না, অথচ এই ভাইদের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ'তাআলা মুসলিমীনদের সম্মানিত করেছেন, মর্যদা বৃদ্ধি করেছেন এবং মুসলমানিত্বের পতাকাকে সমুন্নত করে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমীহ অর্জনে সক্ষম করেছেন।[১১] আল্লাহ'র ইচ্ছায়, এঁদেরই কারনে আজ, তথাকথিত 'সুপার পাওয়ার' ইসলামকে ভয় পায়, শ্রদ্ধা করে এবং মুসলমানদের সাথে কিছু করতে চাইলে কয়েকবার ভাবে। যাই হোক, 'ওয়াহান'[১২] তথা 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুকে ঘৃণার' কালো ছায়া আজ মানুষের অন্তরে ভর করেছে। ফলে তারা গাফেল হয়ে রয়েছ। এবং তারা দেখেনা। মহান আল্লাহ'তাআলা যেন আমাদের সকলকে 'ওয়াহান' থেকে মুক্তি দান করেন এবং এই উম্মাহকে জিহাদের পথে অটল অবিচল রাখেন যেভাবে তিনি পছন্দ করেন এবং পুনরায় আমাদের খিলাফাহ'র স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে দেন।

৫। উপসংহারঃ

পরিশেষে সারকথাটুকু এই যে, মুসলমানিত্বের প্রথম ফরয- তাওহীদকে বোঝা ও একে বাস্তবায়ন করা। আর "বর্তমানে", তাওহীদ বাস্তবায়নের একমাত্র সঠিক পথই হল 'জিহাদ'।

মূল বাংলা বইটি নিচের লিংকে পাওয়া যেতে পারেঃ

[১১] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) , পৃষ্ঠা নং ৫, শেষের প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য
[১২] তাওহীদ আল-'আমালী, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং ৬, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য

https://ia৬০০২০১.us.archive.org/১৯/i...on_BENGALI.pdf

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৭৯১

মুরজিয়া ও কুফর-শায়খ সুলাইমান আল-উলওয়ান

আবু আহনাফ

Senior Member

০৯-২১-২০১৮

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এ ব্যাপারে একমত যে কুফর হতে পারে কথার মাধ্যমে, যেমন দ্বীনের কোন বিষয়কে স্পষ্ট উপহাস (ইস্তিহযা) করা। এবং কুফর হতে পারে কোন কর্মের মাধ্যমে, যেমন কোন মূর্তি অথবা চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির জন্য সিজদায় অবনত হওয়া, অথবা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে পশু জবাই করা।

কোন ব্যক্তি থেকে কুফর এর কিছু সংঘটিত হওয়ার কুফর হবার ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণসমূহ খুবই স্পষ্ট। এই কুফর কেবলমাত্র কোন কথা অথবা কোন কর্মের মাধ্যমে হতে পারে, এর সাথে ইচ্ছাকৃত অস্বীকার (জুহদ) অথবা হালাল করা (ইস্তিহলাল) যুক্ত হওয়া ব্যাতীতই। কথা ও কর্মের কুফরকে শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত অস্বীকার (জুহদ) অথবা হালাল করা (ইস্তিহলাল) এর সাথে সীমাবদ্ধ করে দেয়া সহীহ নয়। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেয়ীন আজমাঈনগ অথবা ইমামগণের কেউ এমন বলেননি।

আল্লাহ বলেনঃ আর যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গুনাহগার। (অবিশ্বাসী কাফির, মুশরিক, পাপী, অপরাধী ইত্যাদি) (-সূরা আত তাওবাহঃ ৬৫)

এবং এখানে কুফরের কারণ ছিলো 'কথা' যা তারা শুধু উচ্চারণ করেছিলো।

আর আল্লাহ বলেনঃ তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে যে, আমরা (কোন খারাপ কিছু) বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং মুসলমান হবার পর কাফির হয়েছে। তারা কামনা করছিলো এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী

করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তাওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল, আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে ও আখেরাতে বেদনাদায়ক আযাব দিবেন। অতএব বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (সূরা আত তাওবাহঃ ৭৪)

কাজেই, চূড়ান্ত কথা হল, যে কেউ পরিস্কারভাবে এমন কিছু বলে, বা এমন কাজ করে যা কুফর, সে কুফরী করেছে। যদি না তাকফিরের কোন প্রতিবন্ধক যেমন বাধ্য-বাধকতা (ইকরাহ), ব্যখ্যা (তাবীল), দুর্ঘটনাজনিত ভুল (খাত্বা) যেমন জিহ্বার স্খলন অথবা অজ্ঞতার কারনে ভুল বলে ফেলা ইত্যাদির মতো বিবেচনাযোগ্য কোন বিষয় তার মাঝে পাওয়া যায়।

এবং সুস্পষ্ট কুফর এর মধ্যে একটি হল সম্পূর্ণভাবে আমাল এর শ্রেণীকে (জিনস আল-আমাল) পরিত্যাগ করা। অন্তরের আমলের সাথে যুক্ত করা ব্যাতীতই এটি সুস্পষ্ট কুফর। কারণ সম্পূর্ণভাবে আমলের শ্রেণী পরিত্যাগ করা নিজেই বড় কুফর (কুফর আকবর)। আর যা আবশ্যিক তার অনুপস্থিতিকে আমরা অন্তরের অবস্থার উপর প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করি, তবে হুকুম লাগানোর জন্য অন্তরের অবস্থাকে শর্ত করা ব্যতীত। আর এটি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্ট যে, বাহ্যিক আমলের উপরই হুকুম লাগানো হবে, তাঁর অন্তরে কী লুকায়িত রয়েছে এটার উপর নয়, কারণ এটি (অন্তরের অবস্থা) একমাত্র গায়েবের মালিক আল্লাহ তা'আলাই জানেন, অন্য কেউ নয়।

হাফিয ইবনু রজব আল হাম্বলী রহ. ফতহুল বারী ১/২৩ তে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেছেন,

"মুরজিয়ারা বলে ফরযগুলোকে বর্জন করা হল নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার মত গুনাহ। কিন্তু এ দুটি এক রকম নয়, কেননা, হারাম কাজকে হারাম মনে করে (অর্থাৎ ইস্তিহলাল না করে) ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে লিপ্ত হওয়া একটি অবাধ্যতা। কিন্তু কোন অজুহাত ও অজ্ঞতা ব্যতিত ফরযগুলোকে বর্জন করা কুফর"।

আর এর প্রমান হল হযরত আদম (আ.) ও ইবলিশ এর ঘটনা এবং ইয়াহুদী আলিমদের এই বিষয়টি যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে তারা মুখে স্বীকার করতো যে এখন নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু

তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত বিধান ও শরীয়াহ অনুযায়ী আমল করতো না।

হারব বর্ণনা করেছেন ইসহাক থেকে, তিনি বলেছেনঃ

"মুরজিয়ারা অব্যাহতভাবে চরম পর্যায়ে যেতে থাকলো এবং এক পর্যায়ে বললো, 'যে ব্যক্তি নির্ধারিত সালাত, রমযানের রোযা, যাকাত এবং হজ্ব এবং অন্যান্য সকল ফরজকে অস্বীকার (জুহদ) করা ব্যতিত ছেড়ে দেয়, আমরা তাদেরকে তাকফীর করিনা। তাঁর হিসাব আল্লাহর কাছে, কারণ সে ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা এগুলোর ফরজ হওয়াকে স্বীকার করেছে।'। সুতরাং এরা সন্দেহাতীতভাবে তারাই; অর্থাৎ মুরজিয়া"।

আল-খাল্লাল 'আস সুন্নাহ' ৩/৫৮৬ এ 'উবাইদুল্লাহ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

"আবি হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আল-হুমাইদী বলেন, 'আমাকে এটা জানানো হয়েছে যে, এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা বলে, 'যে ব্যক্তি সালাত, যাকাত এবং সিয়াম, হজ্ব এগুলোকে স্বীকার করে নেয় কিন্তু এগুলোর কোনটা মৃত্যু পর্যন্ত পালন করে না, অথবা পেছন ফিরে, ঠেস দিয়ে কেবলার বিপরীত দিক হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সালাত আদায় করে, সে একজন মুমিন বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এসবের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে...। সুতরাং আমি বলি "এটা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহ এবং মুসলিমদের আমলকে সুস্পষ্ট অস্বীকার করা"।
আল্লাহ বলেছেনঃ "হুনাফা; আর তারা সালাত আদায় করে যাকাত দেয় এবং এটাই সত্যিকারের দ্বীন"

এবং হাম্বল বলেছেন "আমি আবু আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন বলে সে আল্লাহর উপর কুফর করেছে, তাঁর আদেশ অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকার করেছে যা সহ তাঁর রাসূল প্রেরিত হয়েছেন।

আর ইমাম ইবনে বাত্তাহ বলেছেন, "সুতরাং যে কেউ যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কিতাবে আদেশ দিয়েছেন অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহতে আদেশ দিয়েছেন এমন বাধ্যতামূলক কাজকে (আল ফারাইয) ছেড়ে দেবে, ইচ্ছাকৃতভ অস্বীকার (জুহুদ) অথবা অন্তর থেকে অবিশ্বাস (তাকসিব) –এর কারণে, তাহলে সে স্পষ্টতই একজন অবিশ্বাসী (কাফির)। আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এতে সন্দেহ করতে পারেনা। আর যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশ্বাস করে এবং মুখে এর স্বীকৃতি দেয় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এগুলো ছেড়ে দেয়, অবহেলাভরে, খেলাচ্ছলে অথবা মুরজিয়াদের মত মাযহাবে বিশ্বাসী হয়ে, তাহলে সে একজন ঈমান ত্যাগকারী। স্বল্প কিংবা বেশি, ঈমানের কোন অংশই তাঁর অন্তরে বিদ্যমান নেই। এবং সে ঐরকম মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নিফাকীতে লিপ্ত হয়েছিল। কাজেই কোরআন তাদের বিবরণ এবং তাদের জন্য যা জমা করা হয়েছে তা প্রকাশ করে দিয়েছে এবং এটাও বলে দিয়েছে যে তাদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে। আমরা আল্লাহর কাছে এ সকল মুরজিয়াদের চিন্তাধারা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। [আল-ইবানাহ-২/৭৬৪]

পূর্ববর্তী ইমামগণ মুরজিয়াদের সম্পর্কে সতর্ক করে গিয়েছেন এবং তাদের বক্তব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাদের বিদ'আতের বিপদ সম্পর্কে স্পষ্ট করে গিয়েছেন।

ইমাম আয যুহরী বলেন, "ইসলামের মধ্যে এর (ইরজার) চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কোন বিদ'আতই প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ 'ইরজা'"। [আল-ইবানাহ-২/৮৮৫]

এবং ইমাম আওযায়ী বলেন, "ইয়াহয়া এবং ক্বাতাদাহ বলতেন, "খাহেশাতের মধ্যে উম্মাহর উপর আর কোনকিছু তাদের কাছে ইরজার চেয়ে অধিক ভীতিকর ছিল না।" [আল-ইবানাহ ২/৮৮৫-৮৮৬]

আর শুরাইক বলেন, "তারা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। চরমপন্থীরা শীয়া'রা (রা'ওয়াফিয) মন্দে যথেষ্ট, কিন্তু মুরজিয়ার মিথ্যারোপ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে"। [আস-সুন্নাহ ১/৩১২]

শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-উলওয়ানের'নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিজয় আসন্ন' (আলা ইন্না নাসরুল্লাহি কারিব) বই থেকে নেয়া।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮৩৪

তালেবানরা কি জাতীয়তাবাদী? - আইএস অনুসারীদের মিথ্যাচারের জবাব!

আবু উসাইমিন

Junior Member

১০-১৪-২০১৮

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

বিশ্বব্যাপী মুজাহিদীনের মাঝে ফেতনা সৃষ্টিকারী একটি সংগঠনের নাম হলো আইসিস। বিভিন্ন জিহাদী ময়দানে দলটির উপস্থিতি মুজাহিদীন এবং কুফফার বাহিনীর মূল যুদ্ধকে আড়াল করে দিচ্ছে! আফগানিস্তানের পবিত্র জিহাদী ভূমিতেও আইসিস ফেতনার উদ্ভব ঘটেছে! যদিও ফেতনা সৃষ্টিকারী এই দলটির মুখোশ আল্লাহ তা'য়ালা সত্যন্বেষীদের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছেন শুরু লগ্নেই। তবে, চক্রান্তকারীরা তাদের কুচক্রান্ত প্রক্রিয়া থামায়নি। আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিকে ইসলামী শরীয়ার অধীনে পরিচালিত করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বহু ত্যাগ স্বীকার করে লড়াই করে আসা তালেবান মুজাহিদীনের ব্যাপারে নানা ধরণের মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে আইএস ভক্তরা। ঐ সকল প্রচারণা তাদের মিথ্যাচার এবং শরয়ী জ্ঞানের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। ২০১৫ সালের ১লা নভেম্বরে আল-জাজিরা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিও রিপোর্টের ভিত্তিতে এদেশীয় কিছু আইএসভক্ত জোর গলায় প্রথমে অপবাদ দেয় যে, তালেবান জাতীয়তাবাদী। তারপর, তারা জাতীয়তাবাদের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে তালেবানকে মুরতাদ প্রমাণের নিকৃষ্ট চেষ্টা চালায়। যদিও জাতীয়তাবাদী মানেই মুরতাদ কিনা সে বিষয়টিও বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। যাইহোক, আজ আপনাদের সামনে তালেবান কি জাতীয়তাবাদী কি না সে বিষয়টিই তুলে ধরা উদ্দেশ্য। আইএস ভক্তদের সরবরাহ করা আল-জাজিরার ভিডিওটিতে দেখা যায়- একজন সাবেক তালেবান অফিসিয়াল বলতেছেন যে, ' তালেবানরা বলেন- আমরা আফগানিস্তানের ভৌগলিক সীমারেখা অনুযায়ী আফগানিস্তান স্বাধীন

করতে চাই। আমরা রাশিয়ায় আক্রমণ করতে চাই না, আমরা আমেরিকাতেও আক্রমণ করতে চাই না।'

সাবেক তালেবান অফিসিয়ালের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এ দেশের কিছু আইএসের অনুসারী তালেবানকে প্রথমে জাতীয়তাবাদী এবং পরে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছে। আইএস অনুসারীদের ঐ বক্তব্যে তাদের ইসলামী শরীয়ত বিমুখতা এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি। যাইহোক, আজ তাদের ঐ ভ্রান্ত চিন্তাধারার শরয়ী বিশ্লেষণপূর্বক জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা-বিল্লাহ।

জাতীয়তাবাদ বা আসাবিয়্যাত মানে কি?

তালেবানদের বিরুদ্ধে আইএস অনুসারীদের তোলা জাতীয়তাবাদ বা আসাবিয়্যাতের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পূর্বে শরীয়তের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ বা আসাবিয়্যাহ মানে কী তা বুঝতে হবে। আসাবিয়্যাহ বা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফের ৪৯০৫ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

وَعَنْ وَ اثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: " أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ رواه أبو داود

অর্থাৎ, একজন সাহাবী(হাদিসবর্ণনাকারী) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসাবিয়্যাহ(জাতীয়তাবাদ) মানে কি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ''আসাবিয়্যাহ হলো- জুলুমের ব্যাপারে তোমার কওমকে (জাতিকে) সাহায্য করা।''

সুনানে ইবনে মাজাহ-এর ৩৯৪৯ নম্বর হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে আসাবিয়্যাতের সংজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছেন। হাদিসটি হলো-

يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم

অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি কোন লোক তার জাতিকে ভালোবাসে, তাহলে এটা কি আসাবিয়্যা বলে গণ্য হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- না, বরং আসাবিয়্যাহ হলো- কোন লোক তার কওমকে জুলুমের ব্যাপারে সাহায্য করা।

উপরোক্ত হাদিসদুটির আলোকে বুঝে আসে- আসাবিয়্যাত মানে এই না যে, নিজ জাতিকে ভালোবাসা বা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। বরং, জাতীয়তাবাদ বা আসাবিয়্যাত মানে হলো- নিজ জাতিকে জুলুমের ব্যাপারে সাহায্য করা। অর্থাৎ,শরীয়তের উপরে নিজ জাতিকে প্রাধান্য দেওয়া।

এখন আমরা মূল আলোচনায় আসতে পারি ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত, তালেবানকে জাতীয়তাবাদী বলার ব্যাপারে আইএস অনুসারীদের চিন্তাধারা হলো- কেবল আফগানিস্তানের প্রতি তালেবানের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। আর, এটাকেই আইএস অনুসারীরা জাতীয়তাবাদ বলে চালিয়ে দিচ্ছে এবং তালেবানকে মুরতাদ প্রমাণে এটাকে অন্যতম দলিল হিসেবে পেশ করছে!! কিন্তু, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে আমরা দেখলাম যে, আইএস অনুসারীদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এরূপ চিন্তাধারার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। বরং, এ ধরণের চিন্তাধারা হলো সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, যেখানে জাতীয়তাবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয় একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা ভাষাভিত্তিক জাতির উপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ মানে হলো- ইসলামী শরীয়তের উপরে গোত্র, বর্ণ, জাতিগত পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া। আর, এই নীতি অবলম্বন করে জুলুমের ব্যাপারে নিজ জাতিকে সাহায্য করা। অর্থাৎ, কেউ যখন তার পিতৃপরিচয়, বা গোত্র পরিচয়- এগুলোর কারণে আল্লাহ বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করেনি, বা এসব কারণে শরীয়তের হুকুম লঙ্ঘন করেছে বা শরীয়তের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকেনি তখন সেটাকে বলা হয়েছে জাতীয়তাবাদ। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআকে জাতীয়তা বা সীমান্ত দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা; যেমন- যে বাংলাদেশী সেই আমার বন্ধু, যে বাংলাদেশী নয়, তার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই!- এরূপ করাটা হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে আসাবিয়্যাহ বা জাতীয়তাবাদ। কিন্তু, এগুলোর কোনোটিই

তালেবান মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, তালেবানদের উপর আইএস অনুসারীদের আনীত জাতীয়তাবাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । আর, এখানে আইএস অনুসারীদের মূর্খতার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে। আশা করি, বিষয়টি কারো কাছে এখন অস্পষ্ট নেই।

দ্বিতীয়ত, এখন প্রশ্ন হতে পারে- তালেবান কি আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআকে সীমান্ত দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেছে? আমেরিকা বা রাশিয়া অর্থাৎ বহির্বিশ্বে তালেবানের আক্রমণ না করার ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে?

এ ব্যাপারে আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লাহু আ'লাম। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআর ক্ষেত্রে তালেবানরা যে সীমান্তকে বা জাতীয়তাকে প্রাধান্য দেয়নি, তা সারা বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট। যখন শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তালেবান প্রধানকে বলা হলো, তখন তালেবান প্রধানের প্রতিক্রিয়া সবার কাছে দিনের আলোর ন্যায় পরিষ্কার। তালেবান তখন আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআর ব্যাপারে সীমান্ত বা জাতীয়তাকে প্রাধান্য দেননি। বরং, নিজেদের জান-মালকে হুমকির মুখোমুখি করেও একজন মুসলিম ভাইকে কাফেরদের হাতে তুলে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একইভাবে, সীমান্ত বা জাতীয়তার পার্থক্যকে দূরে ঠেলে সারাবিশ্বের যেখান থেকে মুহাজিরিন ও মুজাহিদীন হিজরত করেছেন তাদের সকলকে তালেবান সরকার আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। উনাদের তখনো এই শক্তি ছিল না যে, উনারা আফগানিস্তান থেকে বাহিনী নিয়ে বের হয়ে কাশ্মীর মুক্ত করে ফেলবেন। কিন্তু, উনারা কাশ্মীরী মুজাহিদীনকে আফগানিস্তানে ট্রেনিং নিতে দিয়েছেন। সাধ্যমত বিভিন্ন দলকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন। মাসউদ আজহার সাহেবকে যখন মুক্ত করা হলো, তখন সেই প্লেন আফগানিস্তানে ল্যান্ড করেছে। সুতরাং বাস্তবতা হলো- ইমারত শক্তিশালী থাকাকালীন তাদের আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআর নীতি ছিল শরীয়তেরই নীতি। আর আজও তারা সেই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে বলে মনে করি।

আর, যদি তালেবানের বহির্বিশ্বে আক্রমণের বিষয়ে বলি, তাহলে বুঝতে হবে- ইসলামী ইমারত কি এখনো পুরো আফগানিস্তান দখল করতে পেরেছে? উনারা কি পুরো খোরাসানে তামকিন পেয়েছেন? - না । বরং, উনারা গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত।

যেখানে কখনো শত্রুরা জিতে, কখনো উনারা জিতেন। এই অবস্থায় উনারা কেনো শত্রু সংখ্যা বাড়াতে চাইবেন? এটা নববী সিয়াসা আশ-শরীয়াহ এর একটি নীতি- শত্রু সংখ্যা কম রাখা । দায়েশ যেমন সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে বায়াত চেয়েছে, অথচ তাদের ইমারতের তামকিন ছিল ইরাক ও সিরিয়া আর কিছু জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের ঘোষণা গ্লোবাল ছিলো- কিন্তু সেই কথার পেছনে কোন বাস্তবতা ছিল না।

তালেবানের মুজাহিদীনের এখন বহির্বিশ্বে আক্রমণ না করার কথা বলায় তো শরয়ী কোন সমস্যা নেই! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একই সময়ে সবার সাথে যুদ্ধ করেননি! প্রথমে আগ্রাসী কুরাইশের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মকভাবে, তারপর ইহুদী, তারপর বাকি আরববিশ্ব। এই ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি। আর, তালেবান মুজাহিদীন যদি বহির্বিশ্বে আক্রমণ না করার কথাও বলেন, তারা কি বহির্বিশ্বে আক্রমণ করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন?!!!! না, বরং এমন একটি দলের (আল-কায়েদা) বায়াত গ্রহণ করেছেন যে দলটি সারাবিশ্বে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং, তালেবান মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদবিরোধীর অভিযোগ তোলা মূর্খতা ও শয়তানী বৈ নয় ।

আবার দেখুন- যদি আমি দায়েশের কথা মেনেও নেই, তাহলে সর্বোচ্চ এটা বলা যায় যে, তালিবান একটি স্থানীয় জিহাদী আন্দোলন। তারা আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারত কায়েমের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, তারা স্থানীয় জিহাদ করছেন। তাও কিন্তু জাতীয়তাবাদ বলা যায় না।

মূলত: দায়েশের(আইএস) সমস্যা হলো তারা কিছু নতুন পরিভাষা তৈরি করেছে। শাহওয়াত, জাতীয়তাবাদ- এই সব। এগুলোর সংজ্ঞা কী, সেটা তারা পরিষ্কার করে না। এগুলো শরয়ী পরিভাষা নয়। কিন্তু, এই পরিভাষার উপর ভিত্তি করে তারা শরয়ী হুকুম প্রয়োগ করে।

যেমন:-

১। অমুক ব্যক্তি জাতীয়তাবাদী।

২। জাতীয়তাবাদ রিদ্দা(এখানে কিন্তু তাফসিল প্রয়োজন, যে জাতীয়তাবাদ বলতে কী বুঝানো হচ্ছে)

৩। অতএব, অমুক ব্যক্তি মুরতাদ।

এগুলো হলো জাহালতের কথা। আর তাদের বিকৃত মানহাজের পরিচায়ক। তাদের লিডাররা এগুলো বুঝে শুনেই করে। কারণ তারা চায়, দুনিয়াতে তারাই একমাত্র বৈধ জিহাদী জামাআত- এটা প্রমাণ করতে। আর তাদের কর্মীরা বেশিরভাগই মাথামোটা। এরা মুখস্থ কথা বলে, এদের পড়াশোনা কম। সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে তাদের কার্যক্রমই তাদের মূর্খতার পরিচয় বহন করে! যাইহোক, আল্লাহর কাছে দ্বীনী বিষয়ে মূর্খতা থেকে পানাহ চাই।

“আমি আবেগী হতে পারি, তবে নই বাস্তবতায় বিমুখ, জানি কারাগার কেড়ে নিতে পারে মোর জীবনের সব সুখ। জেনে বুঝেই আমি বেছে নিয়েছি শত কষ্টের এই পথ,যে পথ নিয়ে যাবে জান্নাতে, সে পথে অটল থাকার করেছি শপথ।”

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১২০০

আলকায়েদা ও তালেবানের মানহাজগত পার্থক্য : প্রোপাগান্ডা ও বিশ্লেষণ

Ibne Taimiya

Member

০৯-২২-২০১৮

ইদানিং ফেসবুকে কিছু ভাই প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, আলকায়েদা ও তালেবানের মানহাজ ভিন্ন। নিঃসন্দেহে এসব কথাবার্তা বিভ্রান্তিকর, অযৌক্তিক ও নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত।

আমি লক্ষ্য করছি, কিছু দ্বীনী ভাই- যাদেরকে আমি আলকায়েদার সমর্থক মনে করি- তাদের এসব অযৌক্তিক ও অনভিজ্ঞ অথচ চটকদার কথাবার্তার মায়াজালে বিভ্রান্তিতে পতিত হচ্ছেন বা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ছেন। তাদের জন্যই এই লেখাটি।

আমি আমার সংক্ষিপ্ত জানাশোনা ও অনভিজ্ঞ কলমের মাধ্যমে একথা বুঝানোর চেষ্টা করবো যে, যেই বিষয়গুলোর মাধ্যমে তানযীম আলকায়েদা ও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মানহাজগত পার্থক্য ফুটে উঠে, তার বাস্তবতা আসলে কী?

আশা করি, এই লিখাটি পাঠ করে আমরা একথাও বুঝে উঠতে সক্ষম হবো, যেই ভাইয়েরা এসব কথা ছড়াচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য হয়তো মুজাহিদিন ও তাদের সমর্থকদের মাঝে বিভ্রান্তি ও ফাটল সৃষ্টি করে ইসলামের বিজয়কে বিলম্বিত করা, নয়তো তারা ইসলামের সমরনীতি, সমকালীন বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল এবং আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মধ্যকার মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্যগুলোর ব্যাপারে চরম অজ্ঞ।

আসুন, শুরু করা যাক।

অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সবাই কে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার অনুরোধ করছি। আমি এই প্রবন্ধের সূচনাতেই এর সর্বশেষ ফলাফলটি ঘোষণা করে দিচ্ছি, যেন

প্রতিটি ছত্র এগিয়ে যাবার সাথে সাথে এই ফলাফলের যথার্থতা ও বাস্তবতা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। আর তা হলো- "আলকায়েদা ও তালিবানের মাঝে পার্থক্য কখনোই মানহাজগত নয়, বরং যুদ্ধকৌশল ও সমরনীতিগত।" এই কথাটি মনে রেখে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবো। প্রথমে আমাদের তিনটি বিষয় খুব ভালো করে বুঝতে হবে, যেই তিনটি বিষয়ের অজ্ঞতার কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি।

তা হলো-

এক. সমকালীন যুদ্ধনীতি।

দুই. আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মাঝে কিছু কৌশলগত পার্থক্য।

তিন. ইসলামী সমরনীতির একটি বিশেষ দিক।

>> সমকালীন পশ্চিমা যুদ্ধনীতি

১৯৮৯ সালে কয়েকজন প্রথম সারির অ্যামেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন, “ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে সামরিক ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে।”

তাদের ধারণা ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের যুদ্ধকৌশলের উদ্ভব ঘটবে এবং পুরনো কৌশলগুলোকে হটিয়ে নতুন এ যুদ্ধকৌশলই যুদ্ধের ময়দান নিয়ন্ত্রন করবে । তারা এর নাম দেন “চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ” [Fourth Generation War]। অনেকে একে Assymmetric War বা "শক্তির ভারসাম্যহীনতার যুদ্ধ বলেও অভিহিত করেন।

সামরিক ইতিহাসবিদদের মত অনুযায়ী ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর সামরিক কৌশল ও যুদ্ধের ধরন তিনটি মূল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্যায় ছিল সারিবদ্ধ ভাবে প্রাথমিক যুগের রাইফেল হাতে বিপুল সংখ্যক সেনা শত্রুর বিপরীতে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের উদাহরণ হল অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যথাসম্ভব শত্রুর সেনা ও শত্রুর সম্পদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা।

তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে আগের পর্যায়গুলোর তুলনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ প্রজন্মের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল ট্যাংক ও বিমানের দ্বারা বিভিন্ন সামরিক বিন্যাস [formation] ব্যবহারের মাধ্যমে, শত্রুকে ঘিরে ফেলা। বিশেষজ্ঞদের মতে, "চতুর্থ পর্যায়ের যুদ্ধ একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ। এতে যুদ্ধ হবে মূলত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোন নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির মাঝের পার্থক্যগুলো ক্রমশ মুছে একপর্যায়ে বিলীন হয়ে যাবার অবস্থা হবে। অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থা এবং শান্তিকালীন অবস্থার মাঝে যে পার্থক্য আগের পর্যায়গুলোতে ছিল, সেটা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে মুছে যাবে। এক অর্থে বলা যায়, যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালার আগে উভয় পক্ষই অবিরাম যুদ্ধে [Perpetual War] লিপ্ত থাকবে। আর এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো। যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে মিলিয়ে যাবে। একই সময় একাধিক জায়গায় উদয় হবে আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যাবে।" ১৯৮৯ সালে পশ্চিমা সমরবিদরা এই নতুন ধরনের যুদ্ধের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করার সময় এ পুর্বাভাসও করেছিলেন যে "চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ পশ্চিমা সামরিক শক্তির জন্য বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি করবে। আর তাই এ যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য পশ্চিমা সামরিক বাহিনীগুলোকেও মৌলিক ভাবে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। দর্শন ও বাস্তবায়ন [Ideology & Operation] উভয় ক্ষেত্রে।"(শেষ)

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, যারা আমেরিকা ও তার দোসরদের সাথে ৪G স্টাইলে যুদ্ধ করবে, অর্থাৎ যে যুদ্ধে আমেরিকার প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো, যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে মিলিয়ে যাবে, একই সময় একাধিক জায়গায় উদয় হবে আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যাবে- তাদের ক্ষেত্রে আমেরিকার যুদ্ধকৌশল ভিন্ন হবে। আর যারা একটি নির্দিষ্ট ভুখণ্ডে থেকে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের ক্ষেত্রে আমেরিকার যুদ্ধকৌশল ভিন্ন ধরনের হবে।

মোটকথা, উভয় রকম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমেরিকান 'ওয়ারপলিসি' যেমন ভিন্ন হবে, তেমনি উভয় প্রতিপক্ষের জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধকৌশল ও সমরনীতি গ্রহণ করতে হবে।

>> আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য

এটি একটি সাধারণ বিষয় যে, আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মাঝে কৌশলগত কিছু ভিন্নতা থাকবে। যেমন আক্রমণকারী দলের যুদ্ধনীতি হয় আগ্রাসী ও আপোসহীন। আক্রমণকারী তার শত্রুকে সুস্পষ্টভাবে শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে এবং উপর্যুপরি আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলে। অপরদিকে আক্রমণকারীর তুলনায় আত্মরক্ষাকারী যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা দুর্বল হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষাকারী তার আঞ্চলিক ও অন্যান্য আদর্শিক শত্রুদের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে পক্ষে নিতে সচেষ্ট হয়, তাদের সহায়তা নেয়ার চেষ্টা করে। এবং এমন সকল বিষয়কে এড়িয়ে চলে, যা তার আঞ্চলিক ও আদর্শিক শত্রুকে তার বিরুদ্ধে নতুন করে উস্কে দেয়, এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে তার বিরুদ্ধে নিয়ে যায়।

>> ইসলামের একটি বিশেষ যুদ্ধনীতি

ইসলামী যুদ্ধনীতির একটি বিশেষ দিক হচ্ছে শত্রুদের ধোকার মধ্যে রাখা। রাসূল সা. এর সীরাতে এর অনেক উদাহরণ আছে। গাযওয়ায়ে খন্দকে নুয়াইম বিন মাসউদ ও কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাযি. এর ঘটনা যার মধ্যে অন্যতম।

সহীহ বুখারী হাদীসে এসেছে রাসূল সা. বলেছেন- " **الحرب خدعة** " যুদ্ধ মানেই ধোকা। ইবনে হাজার রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারী তে উল্লেখ করেছেন যে, 'খুদআ' অর্থাৎ ধোকার অর্থ হল, মৌখিকভাবে এমন কথা প্রকাশ করা যা অন্তরের বিপরীত। ইমাম নববী রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যুদ্ধের সময় চুক্তি ও আমান ভঙ্গ ছাড়া যে কোনো পদ্ধতিতে ধোকা দেয়া বৈধ। বরং অনেক ফুক্বাহা একে মুস্তাহাবও বলেছেন।

আশা করি, একজন মনোযোগী পাঠক হিসেবে ইতিমধ্যেই আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কেন আলকায়েদা ও তালেবানের যুদ্ধকৌশলের মাঝে একটি মোটা দাগের পার্থক্য থেকে যাবে, এবং কিভাবে এই রণকৌশলগত পার্থক্যই কখনো উভয় দলের মানহাজগত পার্থক্যের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। তবে যারা এখনও স্পষ্টভাবে বোঝেন নি এবং ধৈর্য্যও হারান নি, তাদের কে অনুরোধ করবো আরও কিছুক্ষণ সাথে থাকুন, এবারে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাবো।

আসলে যারা জামাত কায়েদাতুল জিহাদ ও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মাঝে মানহাজগত পার্থক্যের দাবি করে থাকে, তাদের এই অসার দাবির ভিত্তি হল ইমারতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ের কিছু বার্তা ও বিবৃতি, যেগুলোর মাঝে কৌশলগত কারণে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে বাহ্যিকভাবে আলকায়েদা ও তালেবানের মানহাজগত পার্থক্য ও নীতিগত সাংঘর্ষিকতা ফুটে উঠে।

এর কিছু উদাহরন হল- আলকায়েদা যেমন মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্যকারী সৌদি সহ সকল মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকবর্গকে এবং আল্লাহর শরীয়াহ পরিবর্তনকারী মুসলিম দাবিদার রাষ্ট্রপ্রধান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তাগূত আখ্যা দেয় এবং তাকফীর করে, ইমারতে ইসলামিয়া সরাসরি এমন ঘোষণা দেয় না। বরং কখনো এজাতীয় নামধারী মুসলিম শাসকদের (বিভিন্ন বার্তা বিবৃতিতে) ভাই হিসেবে সম্বোধন করে।

এছাড়াও আছে- ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃক আলকায়েদার সবচেয়ে সফল অপারেশন ৯/১১ এর বরকতময় হামলার সঙ্গে যেকোনো ধরণের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করা। যেমন ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে তালেবানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বার্তায় উল্লেখ করা হয়-

"২০০১ এর ৯/১১ এর ঘটনার পর ষোল বছর পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার প্রকৃত হোতাদের উন্মোচন করতে না কোনো নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্ত করা হয়েছে, আর না করতে দেয়া হয়েছে। একইভাবে এই শিরোনামের অধীনে গণহত্যা চালানো, দেশ দখল করা বিশ্বে এখনো বন্ধ হয় নি।

ইমারতে ইসলামিয়া একেবারে শুরু থেকে এই ঘটনায় যেকোন প্রকারের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে এসেছে এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

কিন্তু এসত্ত্বেও আফগান জাতিকে এই ঘটনার কারণে অন্য যেকারো চাইতে বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এই সকল ইঙ্গিত থেকে একটি প্রশ্নই জাগ্রত হয় যে, এটি কি আসলেই পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ বিশ্বে রুখে দেয়া যেতে পারে? কারণ এর নাম নিয়ে আমেরিকা ও তার মিত্ররা ইসলামী ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছে, আফগান জাতির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং গোত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক রেষারেষি সৃষ্টি করেছে। তারা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করেছে একদিকে, অন্যদিকে দেশে বন্দীখানা বানিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।"(শেষ)

(এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য যে আমেরিকার আগ্রাসীনীতি আর নিরীহ আফগানদের মজলুমিয়্যাত বিশ্ব বিবেকের সামনে তুলে ধরা, তা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।)

যদিও এর বিপরীত তালেবানের অন্যান্য একাধিক বার্তা ও বিবৃতিতে পরক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উভয় দলের হৃদ্যতা, একতা, তালেবান কর্তৃক আলকায়েদার বাইআহ গ্রহণ, ৯/১১ এর ঘটনার প্রশংসা এবং ইমারতের পক্ষ থেকে আলকায়েদাকে তার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য 'ইযনে আম' প্রদান ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। তবে কুরআনের নীতি অনুযায়ী - যাদের অন্তর বক্র, তারা তো কেবল ধোয়াশাপূর্ণ বিষয়ের পেছনেই লেগে থাকে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

যাই হোক, তবুও আমরা উপরোল্লিখিত আমাদের তিন নীতিমালার ভিত্তিতে এজাতীয় বার্তা ও বিবৃতির কৌশলগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

আমরা উপরে জেনে এসেছি 4G warfare তথা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধনীতির কথা। এটি এমন এক রণকৌশল, যত বড় সুপার পাওয়ার, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্র সমূহের অধিকারীই হোক না কেন, এই কৌশলকে দমন করতে ব্যর্থ। স্বয়ং অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তা মাইকেল ভিকারস এই কৌশল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "আমাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও যুদ্ধকৌশল এ ধরনের যুদ্ধের (4th Generation Warfare) জন্য উপযুক্ত না।"

আলকায়েদা নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে সফল আবিষ্কার হলো- এই ৪G Warfare যা বিশ্ব ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার সকল স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এবং সকল ক্রুসেডার ও যায়নিস্টদের শান্তি-ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আলকায়েদার উদ্ভাবিত এই ভিন্নধর্মী যুদ্ধকৌশল শক্তি ও সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের হাতে এমন কিছু বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে, যা অন্যকোনো ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

যেহেতু আলকায়েদার নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নেই আবার পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডই তাদের ভূখণ্ড, এবং যেহেতু তারা সবরকম ধরাছোঁয়ার বাইরে, হঠাৎ উদয় হয়ে সহসা হারিয়ে যাওয়া অতিপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই আলকায়েদা মুসলিমদের চিরশত্রু সকল ক্রুসেডার, যায়নিস্ট ও মুসলিম নামধারী তাদের দোসরদের একক ও সম্মিলিত শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে একই সাথে তাদের সকলের বিরুদ্ধে এক অমিমাংসিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কেবল সেই অভূতপূর্ব যুদ্ধকৌশলটি গ্রহণের কারণে।

এর বিপরীতে তালেবানের অবস্থা ও অবস্থান একদমই ভিন্ন। তারা নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যদি তারা পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে কি হিতে বিপরীত না হয়ে উপায় আছে?

আলকায়েদা পৃথিবীর সকল কুফ্ফার ও তাদের দোসরদের জন্য এক মূর্তমান আতঙ্ক। এক জীবন্ত ত্রাস। শত্রুরা মরিয়া হয়ে তাদের সকল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আলকায়েদার সামান্য চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু তারা বারবার হতাশ হচ্ছে।

এমতাবস্থায় ৩G নীতিতে যুদ্ধকারী কোনো দলের জন্য কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজেদেরকে আলকায়েদার সহযোগী ও সহযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করা?

তালেবানের অবস্থান যেহেতু নির্দিষ্ট, এই নির্দিষ্ট অবস্থানের উপর পুরো পৃথিবী যদি একযোগে আক্রমণ করে বসে, তাহলে কি আফগানের আর এক ইঞ্চি ভূমিরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে?

এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই তো শামে আলকায়েদার শক্তিশালী সমর্থক জাবহাতুন নুসরার আমীর শাইখ জাউলানী হাফি. আলকায়েদার নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে আলকায়েদার সাথে নিজেদের সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অতএব আবস্থার চাহিদা অনুযায়ী তো ইমারতে ইসলামিয়ার যুদ্ধকৌশল কিছুটা আপোসমূলক হওয়ারই দাবি করে। যেখানে সে তার শত্রু সংখ্যা কমিয়ে আনবে। শত্রুকে শান্তি আলোচনার আহ্বান জানাবে। এবং কখনও আন্তর্জাতিক জনমতকে পক্ষে টানার জন্য সুকৌশলে আলকায়েদার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করবে।

আর হচ্ছেও এমনটাই। তাই বলে কি একে মানহাজগত পার্থক্য বলা যাবে? এটা তো স্রেফ কৌশলগত পার্থক্য। যা কিনা কেবল কিছু রাজনৈতিক বার্তা বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এছাড়াও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কৌশলগত দাবিও তো এই যে, অন্যান্য আঞ্চলিক শত্রুদের সাথে সমঝোতা করে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অবশ্যই আলকায়েদার যারা শত্রু, তারা তালেবানেরও শত্রু। বরং পুরো মুসলিম বিশ্বেরই তারা শত্রু। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে কি তালেবানের জন্য সকলকে একইসাথে শত্রু ঘোষণা করাটা সমীচীন হবে?

এজন্যই দেখা যায়, বর্তমান আলে সৌদের তাগূত শাসকবর্গকে, যারা আসলেই ইসলাম ও মুসলিমদের চরম শত্রু, যারা নববী ভূখণ্ডের পবিত্রতা নষ্টকারী, আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিসের বিক্রেতা, কখনও ইমারতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তাদেরকে ভাই হিসেবে সম্বোধন করে। এটি তো স্রেফ একটি রাজনৈতিক বক্তব্য, যার উদ্দেশ্য হতে পারে মুসলিমদের রক্ত হালালকারী আমেরিকার প্রধান মিত্র সৌদি শাসকদের রক্তচক্ষু থেকে আফগানকে পবিত্র রাখা। আর ইসলামের অন্যতম যুদ্ধনীতি- " الحرب خدعة " এর দাবি অনুযায়ী তো এজাতীয় ধোকা ও প্রতারণামূলক বক্তব্য তো শুধু বৈধই না বরং মুস্তাহাব বিষয়। বস্তুত বিরোধপূর্ণ এসব বক্তব্য এই নীতির আলোকেই দেয়া হয়। অন্যান্য শত্রুদের দমিয়ে রেখে, সীমিত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে, একক শত্রুর মোকাবেলায় প্রতিরোধ যুদ্ধকে জোরদার করার জন্য।

আর এজাতীয় যুদ্ধ-কৌশলগত পার্থক্যকেই কেউ কেউ মানহাজগত পার্থক্য ভেবে ধোকা খায় কিংবা পার্থক্য ধরে নিয়ে অন্যদের ধোকা দেয়। এরা হয়তো অন্ধ, অজ্ঞ কিংবা ফিতনা সৃষ্টিকারী। এরা কি দেখেনি ইমারাতে ইসলামিয়ার পর পর তিনজন আমীর আলকায়েদার বাইআহ গ্রহণ করেছেন?

প্রিয় ভাইয়েরা! আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, যেই বিষয়গুলোকে জামাত কায়েদাতুল জিহাদ ও ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মাঝে মানহাজগত পার্থক্য হিসেবে প্রচার করা হয় তা মূলত মানহাজগত পার্থক্য না, বরং যুদ্ধ-কৌশলগত পার্থক্য।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মাঝে কৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকাই কি স্বাভাবিক নয়? কৌশলগত পার্থক্য আর মানহাজগত পার্থক্য কি একই জিনিস?
(কায়েদাতুল জিহাদের আরবী ম্যাগাজিন "আল-আনসার"-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ "Fourth-Generation Wars" ও অন্যান্য সূত্র অবলম্বনে)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮৫৬

তথাকথিত গনতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কুরআনী শাসন কায়েম করার দাবি একেবারে অযৌক্তিক

karimul islam

Senior Member

১০-৩১-২০১৮

ان الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي اله و أصحابه أجمعين

গনতন্ত্রের রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে কোরআন দিয়ে দেশ পরিচালনার দাবিদার অনেক। কিন্তু বিষয়টি খুবই অযৌক্তিক। এ দাবীদাররা হয়ত এ বিষয়ে অজ্ঞ নয়ত জেনে-বুঝে মানুষকে গোমরাহ করার কাজে লিপ্ত। এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। সব কথা বলার সুযোগ নেই। বাস্তবতার আলোকে কিছু কথা বলব ইনশাআল্লাহ।যা আশা করি সবার বোধগম্য হবে ইনশাআল্লাহ ।(বিশেষভাবে বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক দলগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এ আলোচনা,এ কারনে এখানে বাংলাদেশ সংবিধান থেকে আলোচনা আসবে বুঝানোর সুবিধার্থে)। পুরো পোস্ট ধর্য্য সহকারে খেয়াল করে পড়ার অনুরোধ রইল। খেয়াল করে না পড়লে বুঝে না ও আসতে পারে।

*কোরআনী আইনে দেশ পরিচালনা বলতে আমরা বুঝি সব বিষয়ে আইন কোরআন-সুন্নাহর হওয়া। ও কোরআন সুন্নাহর বিপরীত কোন আইন না থাকা।এখানে আইন হবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার। এর বিপরীতে কারো আইন হবেনা। আর আল্লাহর আইন দেওয়াই আছে। এর জন্য আবার আলাদা সংবিধান বানাতে হবেনা।

*বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান কুফুরী (অন্য সব দেশেরটা ও কুফুরী) । এখানে আল্লাহর আইন নেই। মানব রচিত আইনে এ সংবিধান রচিত। এটা ইসলামী সব গনতান্ত্রিকই স্বীকার করবে।

*তাহলে এখন ফলাফল দাড়াচ্ছে, বর্তমান সংবিধান কুফুরী আর গনতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো ক্ষমতায় এসে এ সংবিধান বাদ দিয়ে কোরআনের আইন কায়েম করবে। কারন এ সংবিধান থাকলে কোরআনী আইন প্রতিষ্ঠা হলোনা। যেহেতু সংবিধান কোরআনী আইনের বিপরীত।তাই এটিকে বাদ করতে হবে।

* এখন আমরা দেখব গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার চেয়ার দখল করে সংবিধান বা সংবিধানের কোন বিধান কেউ পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে কিনা? যদি কেউ অন্য পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে চায় তাহলে সংবিধানে তার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

*সংবিধানের বিধানগুলো ২ প্রকার।

১-মৌলিক। যেগুলো কোনভাবে পরিবর্তন করা যাবেনা।

২-যেগুলো মৌলিক নয়। বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যাবে।

সংবিধানেরদশম ভাগের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংবিধানের মৌলিক নয় এমন বিধানগুলো কিভাবে পরিবর্তন করা যাবে।

সেখানে বলা হয়েছে , সংবিধান সংশোধনের জন্য বিল জমা দিতে হবে, বিলে কোন বিধান সংশোধন করতে হবে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলে এ বিল গ্রহন করা হবেনা। বিল গ্রহন করা হলে এ ব্যাপারে সংসদ সদস্যদের ভোট হবে ও সর্বনিম্ন ৩ ভাগের ২ ভাগ সংসদ সদস্য এ বিলের পক্ষে ভোট দিতে হবে। যদি এর কম ভোট বিলের পক্ষে হয় তাহলে এটি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবেনা। ও সংবিধানের সে বিধান পরিবর্তন হবেনা। যদি এ পরিমান সংসদ সদস্য বিলের পক্ষে ভোট দেয় তাহলে এটি রাষ্টপ্রতির কাছে যাবে সে ৭ দিনের মাঝে এ বিল মঞ্জুর করবেন। তাহলে সে বিধান পরিবর্তন হবে।

*এখানে আমরা দেখলাম কিভাবে সংবিধানের অমৌলিক বিধান পরিবর্তন করা যাবে।
এখন আমরা দেখব সংবিধানের মৌলিক বিধান কখনো পরিবর্তন করা যাবেনা। এ ব্যাপারে সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭ এর খ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কিছু বিধান কখনো পরিবর্তন করা যাবেনা এর মাঝে আছে প্রথম, ২য় ও ৩য় ভাগের সকল বিধান ও একাদশ ভাগের ১৫০ নং আনুচ্ছেদ সহ অন্যান্য মৌলিক বিধান"

*তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সংবিধানের বিধান ২ ধরনের। ১-মৌলিক যা অপরীবর্তনীয়। এ অপরীবর্তনীয় বিধানের মাঝে প্রথম ও ২য় ভাগের বিধান ও অন্তর্ভুক্ত।

২-অমৌলিক। যেগুলো পরিবর্তন করা যাবে ১৪২ অনুচ্ছেদে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে।

*এখন আমরা দেখব যে বিধান কখনো পরিবর্তন করা যাবেনা সে বিধানগুলোর মাঝে কি কি বিধান রয়েছে। সেখানে কোন কুফরী বিধান আছে কিনা?

এখানে অনেক কুফরী বিধান আছে আমি মাত্র ২ টি উল্লেখ করব।

সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭ এর ১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগন।

৭ এর ২ অনুচ্ছেদে আছে এই বাংলাদেশের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের মানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন।

*২য় ভাগে ৮ এর ২ নং অনুচ্ছেদে আছে গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, জাতীয়তাবাদ এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পরিচালনার মূলোনীতি।

*তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এ সংবিধানের যে সকল বিধান কখনো পরিবর্তন করা যাবেনা গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেগুলোর মাঝে রয়েছে বড় বড় কুফর।

**এখন ইসলামী গনতান্ত্রিকদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা গনতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে কি গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান পরিবর্তন করবেন নাকি ক্ষমতার মাধ্যমে?
যদি বলেন গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদে যেভাবে চলে সেভাবে করব তাহলে আমি বলি, যে সংবিধানের শপথ নিয়ে আপনারা ক্ষমতায় যাবেন সে সংবিধানেই লিখা আছে এভাবে করতে পারবেন না। এভাবে সংবিধানের কুফরী আইন পরিবর্তন করা যাবেনা।

আর যদি বলেন যে, না আমরা ক্ষমতায় গিয়ে একসাথে সব কোরআনী আইন কায়েম করব এ সংবিধান বাদ দিব। সংবিধানের সব আইন বাদ দিব তাহলে ও আমি বলি আপনারা এমন করতে পারবেন না।

কেননা যখন এমন করবেন তখন আপনারা এ সংবিধানের বিরুদ্ধে চলে গেলেন অথচ ক্ষমতায় আসার আগে কিছুক্ষন আগে মাত্র এ সংবিধান মনে প্রানে গ্রহন করেছেন এ কথা বলে সংবিধানের শপথ নিয়ে ক্ষমতার চেয়ারে বসেছেন। তখন মনে রাখতে হবে এ সংবিধানের শপথ কিন্তু আপনি একা নেননি। আপনার সাথে দেশের সব সরকারী বাহিনীর লোকেরা ও এর শপথ নিয়েছে। আর আপনারা যখন গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যাবেন বাংলাদেশের ৩০০ আসন কিন্তু আপনারাই পাবেন না। কিছু আসনে আওয়ামী,বি এনপির লোক ও থাকবে। তারা ও কিন্তুএ সংবিধানের শপথ নিয়েছে।

যখন আপনি হঠাত করে সংবিধান বাতিল করবেন কিভাবে করবেন?আপনার সাথের অন্যদলের সংসদ সদস্যরা তখন কি করবে। তাদেরকে কিভাবে দমন করবেন?আপনি ভালো মানুষ একদিনে ক্ষমতায় এসে আল্লাহর আইন প্রতিষঠা করলেন কিন্তু যে সেনাবাহিনী এ সংবিধানের শপথ নিয়েছে তারা তো সবাই ভালোনা। তাদেরকে কিভাবে হাত করবেন? তারা কি আপনাকে ছেড়ে দিবে আপনি সংবিধান পরিবর্তন করলে?

কখনো ছেড়ে দিবেনা। তখন তারা আপনাকে ক্ষমতার চেয়ার থেকে নামিয়ে দিবে ও আপনার ফাসির রায় হবে। কেননা আপনি সংবিধান বাতিল করে দিয়েছেন বে আইনী পদ্ধতিতে। এভাবে সংবিধান বাতিল করলে আপনার এ শাস্তি হবে এটার শপথ নিজেই নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন।

এটার দলীল কি? এটার দলীল কুফরী সংবিধানে আছে।

সনবিধানের ৭ এর ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অসাংবিধানিক কোন পন্থায় কোন ব্যক্তি যদি এ সংবিধানের কোন বিধানের প্রতি জনগনের ভক্তি নষ্ট করে,বা এ সংবিধান বাতিলের উস্কানি দেয়। বা কেউ বাতিল করতে চায় কেউ তাকে সমর্থন করে বা এ জাতীয় কোন কাজের প্লান নেয় এটা জানতে পারলে যারা এ কাজে জড়িত সবার ফাসি হবে। তারা ফাসির যোগ্য।

যদি সংবিধানের কোন বিধান অসাংবিধানিক পন্থায় বাতিল করার প্লান ও এটাকে সমর্থন একজন লোককে ফাসির অপরাধী বানিয়ে দেয়। তাহলে আপনি যখন এত বড় অপরাধ করবেন(সংবিধানের দৃষ্টিতে)সংবিধানই বাতিল করে ফেলবেন তাহলে আপনাকে কি ছেড়ে দেওয়া হবে? তখন আপনাকে রক্ষা করবে কে?

যদি বলেন সেনাবাহীনীকে আমরা আমাদের পক্ষে নিয়ে আসব তাহলে বলব এটা সম্ভব নয়। কারন তারা প্রথমেতো সংবিধানের শপথ নিয়েছে দ্বিতীয়ত তারা বিদেশের চাপে আপনাকে নামিয়ে দিবে।

*আর যদি বলেন আমাদের নিজস্ব লোক আমরা সেনাবাহীনীতে ঢুকাব যারা খারাপ তাদেরকে বাদ দিব তাহলে গনতান্ত্রিক অন্যান্য দল আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। বিদেশ থেকে আপনাদেরকে চাপ দিবে। অন্য গনতান্ত্রিক দলের মাধ্যমে আপনার সাথে যুদ্ধ বাধাবে।বিদেশ থেকে তাদেরকে সাহায্য করবে। তখন কি করবেন? হয়ত তখন ক্ষমতা ছাড়তে হবে নয়ত যুদ্ধ করতে হবে। আর আপনারা যুদ্ধ কিভাবে করবেন তখন? করলে তো এখনই করতেন। তাহলে কিভাবে আপনি এমন স্বপ্ন দেখছেন ক্ষমতায় গিয়ে কোরআনী বিধান কায়েম করবেন? আপনি হয়ত অজ্ঞ না হয় ধোকাবাজ।

*এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার আপনারা যে সংবিধানের শপথ নিয়ে আছেন সে সংবিধানে যা আছে সবকিছুই আপনারা মেনে নিয়েছেন। এ কারনে কেউ সংবিধানের পন্থা ছাড়া ভিন্ন কোন পন্থায় এ সংবিধানের কোন বিধান বাতিল করতে চাইলে তাদেরকে ফাসি দিতে হবে তাদের এ নীতির সাথেও আপনি একমত।

তাহলে ফলাফল দাড়াচ্ছে একদিকে বলছেন আমরা ইসলাম কায়েম করব এ সংবিধান বাতিল করব। অপরদিকে বলছেন যারা এ সংবিধান বাতিল করবে এ সংবিধানের বিপরীত কোন কিছু কায়েম করতে চাইবে তাদেরকে ফাসি দিতে আমরা প্রস্তুত।তাদেরকে আমরা ফাসি দিব।

এ কেমন দ্বিমুখী আচরণ আপনাদের?

যদি আপনি এ দ্বিমুখী আচরন না বুঝে করেন তাহলে এ ব্যাপারে অজ্ঞ। আর বুঝে করলে ধোকাবাজ।

আল্লাহ তায়ালা আমদেরকে বুঝার তৌফিক দিন। আমিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সংবিধানের লিখাগুলো আমি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখেছি বুঝানোর জন্য ও সময়ের অভাবে।

এ কারনে সংবিধানের পিডিএফ লিংক দিয়ে দিলাম। যাদের ইচ্ছা নামিয়ে যে অধ্যায়গুলো বললাম দেখে নিতে পারেন।

(লিংক ডিলেট করা হয়েছে, আর্কাইভ অথবা মিডিয়া ফায়ার বা পি ক্লাউড থেকে লিংক দিন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৪১

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মিথ্যে গণতন্ত্র

[Talhah Bin Ubaidullah]

Senior Member

১১-০৪-২০১৮

যদিও ইরাক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আমেরিকা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা করেনি, এবং সাধারন পরিষদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি, তবুও বাস্তবতা হল জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ দুটোই আমেরিকার পরিকল্পন অনুযায়ীই ১৯৪৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এ গণতন্ত্রকে ঘিরে একটি মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করা হয় আর তা হল, মুসলিম উম্মাহ ও দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই হল মুসলিম উম্মাহর তীব্র সমস্যার কারণ।

তাই বুশ মুসলমানদেরকে গণতন্ত্রের ছায়ায় বসবাস করানোর জন্য উৎসাহী হয়। অতঃপর সে নিজেকে আরব রাজ্যগুলোতে ত্রানকর্তারূপে চিত্রিত করলো। বুশ নিজেকে মানুষের জন্য ঐশ্বরিক সহায়তার দূত তথা খোদা প্রদত্ত সাহায্যকারী হিসেবে পেশ করলো, যে তাদেরকে অন্ধকার থেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আলোর দিকে নিয়ে আসবে।

আর এভাবে সে বিশ্ব মানবতাকে “গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার” আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী বুশ মুসলমানদেরকে এই ফতোয়া প্রদান করে যে, গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বা বিরোধী না। অবাক ব্যাপার হল, কিছু নামধারী মুসলিমরাও আমাদের জন্য এই গণতন্ত্রকে টেনে আনতে চায়। তারা গণতন্ত্রকে এতই সীমাবদ্ধ ভাবে সজ্ঞায়িত করে যে, এটি যেন শুধু ব্যালট বক্সের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শাসক নির্বাচন করার অধিকার।

কিন্তু বাস্তবতা হল, মানুষ, গণতন্ত্র জীবন ও বিশ্বকে নিয়ে এক সামগ্রিক জীবন দর্শন ও চিন্তা থেকে উদ্ভূত একটি ধারণা। যা হল এমন এক সভ্যতার ফসল যা ব্যাপকভাবে ইসলামি সভ্যতা থেকে আলাদা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক।

*পশ্চিমা সভ্যতা গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার নীতির উপর ভিত্তি করে। যখন রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে দেওয়া হলো তখন কোন আইন-কানুন ও হুকুম-আহকাম দ্বারা সমাজ এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে? কে করবে? গণতন্ত্রের আদর্শের মূলনীতি অনুযায়ী, এ প্রশ্নের উত্তর হল – জনগণ।

*ইসলামে বিধানদাতা ও আইনপ্রণেতা হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা; জনগণ শুধু সুলতান বা শাসকের সহযোগী। আর শরিয়ত শাসক নির্বাচনের সঠিক প্রদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছে। এজন্যই খেলাফতের সময়টা ছিল সোনালী যুগ, যা সকলেরই সন্তুষ্টি এবং পছন্দের ছিল। আর খলিফা জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ইসলাম পালনে সহায়তা করতেন। কোনো জাতির বা শাসকের কিংবা সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না।

এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে কয়েকটি পয়েন্ট বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত-

১. শরিয়তের আগে কোনো শাসন নেই :

শরিয়ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, হাকিম হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। আর তিনিই আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহির মাধ্যমে বিধিবিধান নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ

"বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই।" (সুরা ইউসুফ-৪০)

তিনি আরও বলেন-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না তারাই অবিশ্বাসী কাফের।" (সুরা মায়েদা-৪৪)

তিনি আরও বলেছেন-

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"আর আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করুন।" (সুরা মায়েদা-৪৯)

সুতরাং যারাই আল্লাহর বিধান দিয়ে ফায়সালা করবে না তারাই তাগুত। যেমন- আল্লাহ বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আপনি কি ঐ সমস্ত লোকদের দেখেননি যারা ধারণা করে, আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অথচ তারা বিবাদমান বিষয়কে তাগুতের কাছে ফায়সালা চায়। আর তাদের আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে গোমরাহ করতে চায়।" (সুরা নিসা-৬০)

আর আল্লাহর হুকুম জানার মাধ্যম হলো তাঁর রাসূলের উপর নাযিলকৃত ওহি। এজন্যই ফাতরতের তথা শরিয়ত নাযিলের বিরতি কালের মানুষেরা মুক্তি প্রাপ্ত হবে।[১৩][১] আর ফাতরাহ বলা হয় ওই সময়কে, যারা বাতিল কিংবা বিকৃত

[১৩] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا "আমি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে শাস্তি প্রদান করি না"- ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এই আয়াতে আহলে ফাতরাহ'দের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এই মাসআলায় আইম্মায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন হাদিস এবং কদীম তথা নতুন ও পুরাতন নিয়ে। আর তা হলো, ঐ সমস্ত শিশু যারা ছোট অবস্থায় মারা যায় আর তাদের পিতামাতা কাফের থাকে, তাহলে কি হুকুম হবে? এমনিভাবে পাগল, বধির, অতিবৃদ্ধ এবং যারা ফাতরতের সময় মারা গেছে তাদের নিকট দাওয়াতও পৌঁছেনি, তাদের কি হবে? এ বিষয়ে কিছু উলামায়ে কেরাম নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের থেকে কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বস্তুর পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর সকল মতামতগুলোই বিভিন্ন দলীলের কারণে হয়েছে। আর এ বিষয়ের সাথে অনেক বৈপরীত্যশীল সহিহ হাদিসও পাওয়া যায়। শাইখ আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশআরী রহ. এ মতটিকে আহলে

শরিয়তের কারণে একটি নতুন শরিয়ত আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে বসবাস করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"আমি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে শাস্তি প্রদান করি না।" (সুরা বনী ইসরাইল-১৫)

সুতরাং যারা আজ আমাদের জন্য গণতন্ত্রকে টেনে আনতে চায়, যেমন যেসব দাবি করে শাসন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না, তারা হয় আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দাবি করছে যে, আমাদের জ্ঞান আল্লাহর হুকুম থেকে অধিক উপযুক্ত -নাউযুবিল্লাহ! অথবা তারা দাবি করছে আমরা ফাতরাতের সময়ের অধিবাসী। আর আসল ব্যাপার হলো, উভয় দাবিই ভ্রান্ত।

মূলত আকল তথা জ্ঞানের কোনো শাসন ক্ষমতা নেই, কারণ এটি শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং আকল হুকুম পরিচালনা করার দাবিটি ভ্রান্ত। কেননা আক্বলের নামে শাসন করবে স্বার্থরক্ষা, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা।

আর দ্বিতীয় দাবিটি অবৈধ। কারণ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং তাঁর রিসালাতই সর্বশেষ আসমানী রিসালাত। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার বিকৃতি সাধন থেকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

যখন গণতন্ত্র জনগণকে বিধান বানানোর অধিকার দেয় আর ইসলাম এই অধিকার সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত করে, ফলে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। সুতরাং প্রথমটি হবে কুফর আর দ্বিতীয়টি ঈমান।

২. ইসলামে শাসক নির্বাচন করার প্রক্রিয়া :

সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আবু বকর আল বাইহাকীও তার রচিত 'কিতাবুল ই'তিকাদ' এ বিষয়টিকে মজবুতভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে অন্যান্য জ্ঞানী আলেমরা এবং বর্ণনাকারীদের মান যাচাইকারীরাও এ মত ব্যক্ত করেছেন"। – 'মিম্বার আত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ' কর্তৃপক্ষের টিকা।

যারা শুধু গণতন্ত্রকে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে শাসক নির্বাচিত করার মাঝেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেন তারা ভ্রান্ত ধারণায় আছেন।

যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, গণতন্ত্র জনগণকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, ধর্মে মসজিদের কোণায় আবদ্ধ করে, আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের সুফলের কথা বলে। কিন্তু যারা এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত তারা এতে বিভ্রান্ত হন না।
আর ইসলামে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিগুলো হল-

*আবু বকর সিদ্দিক রা. মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন বনি সা'দ গোত্র থেকে আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ'র ভিত্তিতে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তে সঠিক পরামর্শদানে সক্ষম, কোরআন সুন্নাহের জ্ঞানে পারদর্শী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে। অতঃপর মুসলিম উম্মাহ হযরত আবু বকর রা.-কে সন্তুষ্টচিত্তে রবিবার দিন মসজিদের মাঝে পূর্ণ আনুগত্যের বাইয়াহ প্রদান করে।

*অতঃপর খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে সাইয়্যেদুনা আবু বকর রাযি. মনোনীত করে গেছেন। মুসলিম উম্মাহও তাকে সন্তুষ্টচিত্তে বাইআহ প্রদান করেছেন।
*অতঃপর উসমান রা.কে বাইআহ প্রদান করেন। বর্ণিত আছে, আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রা. মদীনার লোকদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ'র সাথে শূরার বিষয়টি শুধু জিজ্ঞাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

*আলী ইবনে আবি তালিব রা. এর শাসনের সময় মদিনার অধিকাংশ অধিবাসী এবং কুফার অধিবাসীগণ তাকে এককভাবে সন্তুষ্টচিত্তে বাইআহ দিয়েছিল।

তাই আমরা যেগুলোকে 'প্রক্রিয়া' বলছি সেগুলো হল বাইআহ দেয়ার আগে খলিফা নির্বাচনের কিছু প্রায়োগিক, ব্যবহারিক পন্থা, আর এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, আর সে উদাহরণও আছে। যেমনটা হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথে যে, আর খোলাফায়ে রাশেদীন এসব প্রায়োগিক পন্থার নির্দিষ্ট কোনো পন্থাকে নিজেদের বা পরবর্তীদের জন্য আবশ্যক করেননি। ব্যালট বাক্স একাধিক প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করার এরকম একটি প্রায়োগিক পন্থা, কিন্তু তাই বলে এর জন্য গণতন্ত্রকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, এটা কোন যৌক্তিক কথা না। একাজটিই (ব্যালট বাক্স) গণতন্ত্রের মৌলিক দাবি নয়। অথচ

উম্মত বোঝানো হচ্ছে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আমাদের পণ্য আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. সভ্যতা ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য :

যারা আমাদের কাছে গণতন্ত্র গ্রহণের দাবি করে তাদের অনেকেই সভ্যতা ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য করে না; অন্য ভাবে বলা যায়, যা কাফিরের কাছ থেকে কী গ্রহণ করা যাবে আর কী গ্রহণ করা যাবে না – এ দুয়ের মধ্যে তারা পার্থক্য করে না। সুতরাং তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, আপনি টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, অস্ত্র এবং এমনকি পোশাক থেকে শুরু করে সমস্ত সরঞ্জাম পশ্চিমাদের ব্যবহার করেন, তাহলে কেন আপনি গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেন?

তাদের উপরই আল্লাহর রসূলের কথা সত্যায়িত হয়।

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم)، قيل: من يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟!

"পূর্ববর্তীদের রীতিনীতিকে তোমরা ইঞ্চি ইঞ্চি এবং বিগত বিগতভাবে অনুসরণ করবে, এমনকি যদি সেগুলো পাথরের গুহায়ও প্রবেশ করে তোমরা তাদের পিছু পিছু সেখানেই প্রবেশ করবে। তাঁকে বলা হলো, কাদের ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহুদি এবং নাসারাদের? তিনি বললেন, তাহলে তারা ছাড়া আর কারা?।" (বুখারি শরীফ- ৬৮৮৯)

আরেকটি বিষয় হলো, গণতন্ত্র কোন প্রযুক্তি না। যেমনটা বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা ইন্টারনেট। বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, ইন্টারনেট এগুলো প্রযুক্তি। এগুলোর সাথে কোন আক্বিদা জড়িত না, জীবন দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত না। তাই মুসলিমরা এগুলো যে কারো কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে, তার ধর্ম যাই হোক না কেন। অন্যদিকে গণতন্ত্র হল এমন এক সভ্যতার ফসল যা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথককরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৪. সংজ্ঞা এবং পরিভাষাগত সমস্যা :

‘গণতন্ত্র’ শব্দটি একটি পশ্চিমা শব্দ, যার অর্থ হলো জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার প্রদান করা, আর তার মৌলিক বিষয় এটির মাঝেই সীমাবদ্ধ। গণতন্ত্রের অনুসারীরা এই অর্থেই গ্রহণ করে।

অতএব এ অর্থের প্রেক্ষিতে (মুসলিম বিশ্বে) গণতন্ত্রের অনুসারীদের প্রতি আমরা বলি –

*গণতন্ত্রে মানুষকে একজন শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করে। *গণতন্ত্রে একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে একজন শাসক হিসাবে বাছাই করার জন্য সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচনের আয়োজন করা হয়ে থাকে

*গণতন্ত্রে মজলিসে শাসককে নির্বাচিত পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ কথাগুলো হল গণতন্ত্রের আংশিক বর্ণনা। যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, এভাবে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করলে বিস্তৃত একটি ধারণাকে সংকোচিত করে প্রকাশ করা হয়। আর এভাবে সংজ্ঞায়িত করা ও শব্দের ব্যবহার ইসলামের ‘ইলমি পদ্ধতি না। কারণ সঠিক ধারণার জন্য সঠিক শব্দ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, যা গ্রহণ করা জায়েজ না তা গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। কারণ এরকম করা হলে, যে ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার অর্থের বিচ্যুতি ঘটে, এবং সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। সুতরাং এভাবে (অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত তিনটি পয়েন্টের মধ্যে) গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হলে তা সঠিক ও সর্বজনীন সংজ্ঞা হয় না। বরং তা এমন একটি সংজ্ঞা হয় যা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বিষয়কে একীভূত করেনি, এবং সংজ্ঞা বহির্ভূত বিষয়গুলোকে সংজ্ঞাতে ঢুকে যেতে বাঁধা প্রদান করেনি।

অতএব, আমরা আইনশাস্ত্রের ভাষায় যাকে শূরা এবং ইসলামি সংস্কৃতি বলি গণতন্ত্রটা তার আধুনিক রূপায়ন নয়। শুধু সঠিক পরিভাষা বা শব্দ ব্যবহার করার মধ্যেই ইসলামি মূলনীতি সীমাবদ্ধ না। শূরার অর্থে সাথে সাংঘর্ষিক একটি বিষয়ের (অর্থাৎ গণতন্ত্র) উপর শূরা শব্দটি প্রয়োগ করলেই সেটা ইসলামি হয়ে যাচ্ছে না।

আর শূরা বলা হয়, ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে। আর এটি ইসলামি শরিয়াতের একটি হুকুম, যার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আর গণতন্ত্র হলো, মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, যার অধীনে নাস্তিক তার নাস্তিকতার জন্য মানুষকে আহ্বান করার অনুমতি পায় এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী এই ঘোষণা করতে পারে যে, ইসলাম বর্তমান জামানার জন্য অনুপযোগী আর কোরআন হলো মানুষের রচিত বইয়ের মতোই, যার সমালোচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও গণতন্ত্র কুফরি এবং নাস্তিকতার দিকে ডাকার সুযোগ করে দেয়।

৫. গণতন্ত্রের নামে মিথ্যা এবং প্রতারণার একটি বর্ণনা :

বলা হয় যে, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। এ কথাটি বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণাপূর্ণ। এমনকি বিশ্বের গণতন্ত্রের অন্যতম দাবিদাররাও সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। আর রাজ্যগুলোর শাসক, সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং সরকার প্রধানরা রাজ্যের ওইসকল ক্ষমতাশীলদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা মোটা অংকের টাকা দিয়ে তাদের স্বার্থ সুরক্ষা করতে পারে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ক্ষমতার শক্তির প্রচলন কেবলমাত্র দুই পক্ষের জন্যই সীমাবদ্ধ হয়। এক দল হলো রিপাবলিকান এবং আরেক দল হলো ডেমোক্রেটিক পার্টি, অথবাকিংবা কনজারভেটিভ পার্টি এবং লেবার পার্টি। সুতরাং এটি গোত্র, বংশ এবং রাজকীয় পরিবারের শাসনের একটি পরিবর্তিত চিত্র নয় কি?

৬. ইসলাম বাস্তবায়নের পূর্বে স্বাধীনতা কামনার ভ্রান্ত ধারণার বর্ণনা:

মুসলিম বিশ্বের কাফির-মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী এবং দালালরা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে এবং পশ্চিমা কুফফারের সহায়তা অথবা আনুগত্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

আর যারা কাফিরদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন –

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"তুমি কখনোই ইহুদি এবং নাসারাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের ধর্ম গ্রহণ করবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১২০)

উদাহরণস্বরূপ, আলজেরিয়ায় 'স্যালভেশন ফ্রন্ট' গণতান্ত্রিকভাবে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সরকার গঠন করার কথা ছিল, কিন্তু সেনাবাহিনী'র হস্তক্ষেপে নির্বাচন বাতিল করা হয় এবং স্যালভেশন ফ্রন্ট'কে নিষিদ্ধ করে তাদের নেতাদের জেলখানায় বন্দি করা হয়।

একইভাবে মিশরের ইখওয়ানকে সরকার একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে লাইসেন্স তথা স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছে, যদিও ইখওয়ান তাদের নিজেদের আদর্শে এবং এ শাসকগোষ্ঠীকে অনেক ছাড়া দিয়েছে।

তারপরও যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে স্বাধীনতা – এঈ স্লোগান তোলে তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন, আমাদের কাছে স্পষ্ট করা হোক, যখন এ ধরণের স্বাধীনতা থেকে বাধা দেওয়া হবে, তখন কর্মপন্থা কী হবে?

৭. গণতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান মানেই একনায়কত্বের দাবি নয় :

আপনি যদি ডেমোক্র্যাটিক তথা গণতান্ত্রিক না হন, তবে আপনি একজন স্বৈরশাসক!

আপনি যদি পুঁজিবাদী না হন, তবে আপনি সমাজতান্ত্রিক!

যদি আপনি স্বাধীনতার দাবি না করেন, তাহলে আপনি অত্যাচারী!

সুতরাং এভাবে আপনি সবসময় দুটি বিকল্পের মধ্যে আটকা পড়ে আছেন, তাই আপনাকে তৃতীয়টি পছন্দ করতে হবে যে, আমি একজন গণতান্ত্রিক নই, আমি একজন স্বৈরশাসক নই, আমার পক্ষে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক হওয়াও সম্ভব নয় এবং আমি পশ্চিমাদের মনগড়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আছি।

আমি একজন মুসলিম আর ইসলামই মূল। এর কোনো বিকল্প নেই। আর ইসলামের শাসক স্বৈরশাসক নয়, তবে সে শরিয়তের বিধিবিধান দ্বারা আবদ্ধ। আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে শরিয়তের আইন কানুন বাস্তবায়ন করার জন্য। শরিয়তের আহকাম পরিচালনা ব্যতীত তার কোনো ক্ষমতা নেই। এজন্য সে যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়ত মোতাবেক আদেশ করবে, ততক্ষণ তা মান্য করা ওয়াজিব। আর নাফরমানীর আদেশের ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

"মুসলমান ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা। চাই তার পছন্দ হোক কিংবা না হোক, যতক্ষণ না নাফরমানীর আদেশ করে। আর যদি নাফরমানীর আদেশ করে তাহলে এক্ষেত্রে কোনো শ্রবণ বা আনুগত্য নেই।" (সহিহ বুখারি-৬৭২৫)

এমনিভাবে যদি তার থেকে কুফরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যায় তাহলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন –

"বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে উত্তম ফায়সালাকারী আছে?'' (সুরা মায়েদা-৫০)[১৪][২]

মূল – শরীফ আব্দুল্লাহ

অনুবাদ – উস্তাদ আহমাদুল্লাহ মুসা

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৯২

[১৪] মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল লেবাননের ম্যাগাজিন 'মাজাল্লাহ আল-ওআয়ি এর মুহররম, ১৪২৬ হি. সংখ্যায়। মাজাল্লাহ আল-ওআয়ি'

যে কাজের দ্বারা হক্ব প্রতিষ্ঠা হয়, কাফেররা তা বন্ধ করে দিতে চায়

Ahlos sogor

Senior Member

১২-১১-২০১৮

ইদানিং ত্বাগুতের লিডার ও তাদের গোলামেরা হকপন্থী মুজাহিদীনের মিডিয়াগুলো বন্ধের জন্য বেহুশ হয়ে গেছে। বিভিন্ন মিডিয়াগুলো বারেবারে বন্ধ করে দিচ্ছে, ডিলেট করে ফেলছে।

আমাদের বুঝা দরকার, আসলে এর কারণ কী? এতে তাদের কী এত ফায়দা? এক কথায় বলতে গেলে, এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এতে তাদের অনেক ফায়দা আছে।

আর বিস্তারিত বলতে গেলে আলাদা একটি পুস্তিকা রচনা হয়ে যাবে। কিন্তু তা করা এই মুহূর্তে সম্ভব না। তবে বুঝানোর জন্য কিছু বিষয় লিখতে তো আর বেশি সময় লাগবে না, তাই লিখছি।

আমরা সবাই জানি, ত্বাগুতদের রয়েছে অনেক শক্তিশালী মিডিয়া, হাজার হাজার মিডিয়া কর্মী, লক্ষ্য লক্ষ্য মিডিয়া রিলিজ, কোটি কোটি টাকা মিডিয়ার ময়দানে ব্যয়খাত। আমাদের বুঝতে হবে, মিডিয়ার পিছনে এত টাকা, সময়, শ্রম ব্যয় করে তাদের কী লাভ হচ্ছে!!!

আমি সকল মুজাহিদ ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলব, হে দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরীগণ! আপনারা আরো চিন্তাশীল হোন। প্রত্যেকটি বিষয় ইতিবাচক-নেতিবাচক এই দুই মূলনীতির আলোকে গবেষণা করুন।

তাহলে দেখবেন দুনিয়ার সকল বিষয়ের হাক্বীকত আপনার কাছে ধরা পড়বে। এবং এখান থেকেই আপনি আরো একটি জিনিস বুঝতে পারবেন, তাহলো কোন বিষয়টি দ্বীনের জন্য উপকারী হবে, কোন বিষয়টি ক্ষতিকর হবে। কোন বিষয়টি কুফফার গোষ্ঠীর জন্য উপকারী, কোনটি তাদের জন্য ক্ষতিকর।

ত্বাগুত গোষ্ঠী যাকিছুই করছে, এই সবকিছুর কারণ একটাই। আর তাহলো, মুসলিমদের ঈমান, আমল, বিজয়, গৌরব ধ্বংস করা।

হে ভাই! একটু চিন্তা করে দেখুন, তারা কীভাবে এই মিডিয়া দিয়ে আমাদের ঈমান, আমল, বিজয়, গৌরবকে নষ্ট করে দিচ্ছে। একটু ফিকির করে দেখুন।

*** তারা কি মিডিয়ার মাধ্যমে ঈমান বিরোধী চিন্তা-চেতনা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে না?**

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এই সবকিছুই কি ঈমান বিধ্বংসী না?

এই চিন্তাধারা গুলো সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছে এই মিডিয়াগুলো না?

নাস্তিক্যবাদ, নারী স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতার ন্যায় জঘন্য ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করেছে এই মিডিয়াগুলো না?

জিহাদ-ক্বিতাল, হুদুদ ক্বিসাস, আমর বিল মারূফ, নাহি আনিল মুনকারের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধানগুলোকে জঙ্গীবাদ, বর্বরতা, স্বাধীনতা হরণকারী বিষয় হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা, মানুষের মগজগুলো সেই আঙ্গিকে ধোলাই করা, এগুলোর পিছনে দায়ী এই মিডিয়াগুলো না?

অবশ্যই এই মিডিয়ার ভূমিকাই এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। কেননা সত্যকে বারেবারে মিথ্যা বলে প্রচার করতে থাকলে এক সময় মানুষ তা মিথ্যা বলেই স্বীকার করে নেয়। মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করতে থাকলে এক সময় তা সত্য বলেই মানুষ মেনে নেয়। আর এটাই তো শেষ যামানার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত আলামত।

আর এই প্রোপাগান্ডাকে নি:শেষ করতে হলে সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে বিরামহীন প্রচার করতে হবে।

***তারা কি মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতার প্রচার প্রসার করে মুসলিমদের আমল ধ্বংস করছে না?**

অশ্লীল মুভি, পর্ণগ্রাফি, নাটক-সিনেমা, কৌতুক ইত্যাদি বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ বিষয়গুলো সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার পিছনে দায়ী কি এই মিডিয়াগুলো

না?

মূর্খ, ধর্মীয় শিক্ষায় অজ্ঞ লোকদের চিন্তাধারা, অহঙ্কারীদের ফ্যাশন-ডিজাইন, ইহুদী-নাসারাদের কৃষ্টি-কালচার সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই মিডিয়াগুলো না? অবশ্যই এই মিডিয়াগুলোর অবদানই এক্ষেত্রে সবচে বেশি।

* তারা কি মুসলিমদের বিজয়, গৌরব ধ্বংস করছে না?

আব্রাহাম, হিটলার, প্লেটো, এরিষ্টেটল, আলেক জান্ডার, মার্টিন লুথার কিং, বিল গেটস, ইত্যাদী গোমরাহ, পথভ্রষ্ট কিছু মানুষের কৃতিত্বকে মানুষে সামনে বড় করে দেখানো, মুসলিম মনিষিদের অবদানগুলো সম্পর্কে মানুষকে অজ্ঞতার মাঝে ডুবিয়ে রাখার পিছনে কি এই মিডিয়াগুলো দায়ী না?

মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তাদের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ ছড়ানো, মুসলিমদেরকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট, বর্বর, অসামাজিক হিসেবে মানুষের কাছে পেশ করে তাদেরকে ছোট করার পিছনে কি এই মিডিয়াগুলো দায়ী না?

#মুসলিমদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মানুষকে এক প্লাটফর্মে আনা, মুজাহিদ দমনে শুধু কাফেরদের নয়; নামধারী মুসলিমদেরকেও ঐক্যমতে নিয়ে আসার পিছনে ভূমিকা এই মিডিয়াগুলোর না?

কুফফারদের বিজিত এলাকাকে সাম্যতা, শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে ফুটিয়ে তোলা, মুসলিমদের বিজিত এলাকাকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, জবর দখলকারীর রাজ্য হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার পিছনে দায়ী এই মিডিয়াগুলা না? অবশ্যই অবশ্যই এই মিডিয়াগুলোই সবচে বেশি দায়ী।

আর এই সবকিছুই এরা করে যাচ্ছে বিরামহীন, কঠিন প্রোপাডান্ডার মাধ্যমে। আমরা যতই এগুলোর বিরোধিতা করি, তারা তাদের কাজ কারেই যাবে, করেই যাবে।

এরই বিপরীতে মুজাহিদগণ যখন সত্য প্রচারের পথ হিসেবে মিডিয়াকে বেছে নিলেন, মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের ঈমান, আমল, বিজয়, গৌরব রক্ষার চেষ্টা শুরু করলেন, তখনি; ঠিক তখনি কাফেরদের ষড়যন্ত্রের জালগুলো, প্রোপাগান্ডার ফলাফলগলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। তাদের সবকিছু ধীরে ধীরে বরবাদ হতে লাগল।

কিন্তু, কুফফারদের সর্দাররা, তাগুতের লিডাররা তো তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা, মেনে নিবেও না। তাদের শতশত বছরের এত অর্থ ব্যয়, সময় ব্যয়, শ্রম ব্যয়, এই সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে, আর তারা চুপ করে থাকবে, তা তো হতে পারেনা।

তাই, এরা তাদের সবকিছু বরবাদকারী হকপন্থী মুজাহিদদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলো বন্ধ করার জন্য বেহুশ হয়ে গেছে। তাদের টাকা, সময়, শ্রম ব্যয়ের আরেকটি নতুন খাত তৈরি করেছে।

সর্বশেষে আমি মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বলবো,

হে মুজাহিদ ভায়েরা! আপনারা অটল হয়ে যান, সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে যান। যার যার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। দেখবেন কীভাবে অহঙ্কারী, কাফেরদের পতন হয়। বিরামহীন লেগে থাকুন। তাদের অল্পকিছু লম্ফজম্ফ দেখে ক্লান্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিবেন না। আল্লাহর সাহায্য কেবল অবিচলভাবে পথে লেগে থাকা ব্যক্তিরাই পায়। আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই বিইযনিল্লাহ।

হে বেঈমানের দলেরা! তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। দেখি কে হারে কে জিতে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৪৫

ইলাহ কী?

imam ibnu taimiah

Junior Member

১২-২৭-২০১৮

লা ইলাহা বাক্যটির ইলাহ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ইলাহ শব্দটির সঠিক অর্থ না জানার কারণে অনেকেই কালেমার সত্যিকার মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হোন। তাছাড়া কুরআনের বহু স্থানে ইলাহ শব্দটি এসেছে। তাই এর অর্থ ও মর্ম যদি আমরা না বুঝি, তাহলে যে কোন সময় আমরা এই শিরকের ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে যেতে পারি। যা আমাদের ঈমানের ভয়াবহ জন্য হুমকিস্বরূপ।

তাই ঈমান বাঁচাতে ইলাহ বলতে কি বুঝায় তা জানা ও মানা আমদের প্রত্যেকের উপরই অত্যন্ত জরুরী,অত্যাবশ্যকীয় কাজ।

ইলাহ মানে কি?

ইলাহ শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। বাংলায় এর অর্থ উপাস্য বা মা'বুদ বলা হলেও অধিকাংশ মানুষই এর মানেও বুঝে না। অনেকে আবার এর দ্বারা শুধুমাত্র মূর্তি বা দেব দেবীকেই বুঝে থাকে। আর মনে করে আমরা তো কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজা,উপাসনা করি না। এই ধারণা একান্তই তাদের অজ্ঞতার ফসল।

ইলাহ বলতে ইবাদাতের যোগ্য বা ইবাদাত লাভ করার যোগ্য এরূপ সত্তাকেও বুঝানো হয়। এই অর্থও যারা জানে তাদের অনেকেই আবার ইবাদাত বলতে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতকেই মনে করে। সেই সাথে ইবাদাতকে তারা প্রচলিত কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। যেমন: বিয়ে-শাদি, জানাযা,জুমআ, ঈদ, খতমে কোরআন ইত্যাদি। অর্থাৎ এগুলোকেই তারা ইবাদাত বলে মনে করে থাকে।

আর ভাবতে থাকে আমরা তো আল্লাহরই ইবাদাত করছি!! অথচ কোরআন-সুন্নাহ ও নবী রসূলদের সিরাহ থেকে স্পষ্ট যে, ইবাদাতের অর্থ তা নয় যা তারা মনে করছে।

এই ধারণার খন্ডন তখনই সম্ভব যখন আপনি ইলাহ শব্দের সঠিক অর্থ জানবেন। আর ইলাহকে ভালভাবে বুঝতে হলে ইবাদাত শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ইবাদাত কি তা জানার মাধ্যমেই ইলাহ শব্দের বাস্তবতা বুঝে আসবে। কারণ ইলাহ মানে যদি ইবাদাতের যোগ্য সত্তা হয়। তাহলে ইবাদাত শব্দের অর্থ জানার মাধ্যমেই আপনি বুঝতে পারবেন কে আসলেই ইবাদাতের যোগ্য এবং কোন কোন কাজকে ইবাদাত বলা হয়। ফলে ইবাদাতের ধারণা স্পষ্ট হলে ইলাহ নিয়ে আর কোন সংশয় থাকবে না ইনশা আল্লাহ।

ইবাদাত কি ?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) তার আল উবুদিয়্যাহ গ্রন্থে ইবাদাতের শারঈ বা বিধিগত অর্থ সম্পর্কে বলেন, ইলাহ মানে ঐ সত্বা যার প্রতি মানুষ তার হৃদয়মন পূর্ণ

একাগ্রতা,ঐকান্তিকতা,ভালবাসা,সম্মানবোধ,ভয়,আশা,ভরসা,সবর,শোকর,নৈকট্য ও তাওয়াক্কুলের গভীর আবেগানুভূতির দিয়ে ঝুঁকে পড়ে।

তিনি (রহঃ) আরো বলেন, ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এর মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় ও তার সন্তুষ্টি হাসিলের সব যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) কথা এবং কাজ অন্তর্ভূক্ত।

সলাত,জিহাদ,সত্যকথা,আমানতদারিতা,প্রতিবেশীর হক,মাতাপিতার সহিত সদাচরণ,ওয়াদা পালন,আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার,জিকির,তিলাওয়াত সহ সকল ভাল কাজই ইবাদাতের অন্তর্ভক্ত। (এমনকি) আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালবাসা, আল্লাহর রহমতের আশা, শাস্তির ভয়, বিনয়,ইখলাস,সবর,শোকর,তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সকল ভাল কাজ ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) সূরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন,

ইবাদাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সার্বিক অপমান ও নীচতা। শারঈ পরিভাষায় ভালবাসা,বিনয়,নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টির নাম ইবাদাত। (তাফসীর ইবনু কাসীর)।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,"হৃদয়,মন,অন্তর এবং শরীর দ্বারা (সবচেয়ে বেশী) ভালবাসা,বিনয়ের একত্ববাদকেই ইবাদাত বলে। ভালবাসা হল আল্লাহর পছন্দ (সন্তুষ্ট,খুশী,প্রিয়,ভালবাসা) কে পছন্দ করা, তার অপছন্দ (ক্রোধ,ঘৃণা,অসন্তোষ) কে ঘৃণা,অপছন্দ করা। (মাজমু আতুল তাওহীদ)।

সালাফদের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, ইবাদাত শুধু বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা পালন করার নাম নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে অন্তরের একাগ্রতা,ভালবাসা,আশা,ভয়-ভীতি,বিনয় ও নম্রতা।

জাহেলী যুগে ইলাহের ধারণা

এখন প্রশ্ন হল মক্কা-মদিনার কাফের মুশরেকরা ইলাহ বলতে কি বুঝতো?? উলুহিয়্যাত সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কি ছিল?? এর উত্তর জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমেই ইলাহ শব্দটির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন এই প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতের মাধ্যমে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যাতে করে ইলাহ এর ধারণা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। এবং আমরা যাতে করে উলুহিয়্যাতের সেইসব গুণ গুলো আল্লাহকে ছাড়া অপর কাউকে বা কোন কিছুকে প্রদান করে সেটাকেই আমাদের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ না করে বসি।

নিম্নের আয়াতগুলো থেকে জানা যায় কীভাবে তারা গায়রুল্লাহকে ইলাহ বানিয়েছিল?? আর ইলাহ বলতে তারা আসলে কি বুঝতো?

ইলাহের প্রথম অর্থ :

আল্লাহ তা আলা বলেন,

তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য ইলাহদেরকে গ্রহণ করেছে যাতে তারা(এসব ইলাহগুলি)তাদের(উপাসক,ইবাদাতকারীদেরজন্য)সহায়ক,সাহায্যকারী,পৃষ্ঠপোষক হয়ে যায়। (সূরা মারয়াম ১৯ : ৮১)।

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যেসমস্ত ইলাহদেরকে আহ্বান করতো যখন (হে নবী) তোমার রবের নির্দেশ এসে পৌছল (তখন তাদের কেউই তাদের কোন কাজে আসলো না বরং) তারা (ইলাহগুলোর উপাসনাই) তাদের (এসব উপাসকদের) ধ্বংসকে বাড়িয়ে দিল। (হুদ ১১:১০১)।

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তারা তো কোন কিছুই সৃষ্টি করে নাই বরং তারা নিজেরাই তো সৃষ্ট। তারা মৃত। এবং কবে উত্থিত হবে তাও বুঝতে পারে না। তাদের ইলাহই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। (নাহাল ১৬ : ২০-২২)।

আর আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহকে ডেকো না। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। (কাসাস ২৮ : ৮৮)।

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য শরীকদের ডাকছে, তারা নিছক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করছে না। তারা কেবল ধারনা-কল্পনার অনুসরণ করে কল্পনার পেছনেই ছুটে চলে। (ইউনুসঃ ৬৬)।

উপরের আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট-

১) জাহেলী যুগের লোকেরা যাকে ইলাহ বলতো, অসুবিধা দূরীকরণ এবং অভাব পূরণের জন্যে তারা তাকে ডাকতো। অন্য কথায়, তারা তার নিকট দোয়া করতো।

২) জ্বিন, ফেরেশতা বা দেবতা ও মৃত ব্যক্তিদেরকেও তারা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।
যেমনটা সূরা নাহলের ২০-২২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩) এ সকল ইলাহ সম্পর্কে তারা ধারণা করতো যে, এসব মিথ্যা ইলাহগুলি) তাদের দোয়া (আহবান) শুনছে এবং তারা বিশ্বাস করতো এসব মিথ্যা ইলাহগুলি গায়েবি ও আধ্যাত্মিকভাবে সর্বাবস্থায় তাদের সাহায্যে হাজির হতে সক্ষম। তারা এগুলোকে হাজির-নাজির ও গায়েবিভাবে মদদ দানকারী মনে করতো। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এদের (এসব মিথ্যা ইলাহদের) নিকট দুআ করতো। নানা রকমের বিপদাপদ, কষ্ট,মুসিবতে নজর, মান্নত, ভয়-ভীতি

ইত্যাদিতে তারা এসব মিথ্যা ইলাহদের নিকট সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করতো। তবে অবস্থা খুব বেশী বেগতিক দেখলে তারা একনিষ্ঠ চিত্তে কেবলই আল্লাহকে ডাকা শুরু করতো। কিন্তু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর তারা পুনঃরায় তাদের শিরকি কাজে লিপ্ত হতো।

ইলাহের দ্বিতীয় অর্থ

আল্লাহ তা আলা বলছেন,

আল্লাহকে ত্যাগ করে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মনে করে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিলো, তারা কেন তাদের সাহায্য করে নি? সাহায্য করা তো দূরে থাক, বরং তারা তাদেরকে ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। তাদের মিথ্যা মনগড়া আচরণের এটাই ছিলো স্বরূপ। (আহকাফ ৪৬ : ২৭-২৮)।

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি কেন তাঁর ইবাদাত করবো না, যাঁর দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে? তাঁকে ত্যাগ করে আমি কি ওদেরকে ইলাহ বানাবো, যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, রহমান যদি আমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না, পারবে না তারা আমাকে মুক্ত করতে? (ইয়াছিন ৩৬: ২২-২৩)।

তারা আল্লাহ ছাড়া এমন শক্তিরও ইবাদাত করছে, যারা তাদের উপকার- অপকার কোনটাই করতে পারে না। তারা বলেঃ এরা আল্লাহ্ র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। (ইউনুস ১০ : ১৮)।

এসকল আয়াতগুলোতে ইলাহ বলতে এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি সার্বিক লাভ-ক্ষতি,কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যিনি সর্বাবস্থায় সব রকমের বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

আর তোমরা একাধিক ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং (এসব বাতিল ইলাহদেরকে ভয় না করে) তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। (নাহল ১৬ : ৫১)।

ইব্রাহীম বলেন), তোমারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক করছো আমি তাদেরকে আদৌ ভয় করি না। অবশ্য আমার রব যদি কিছু চান তবে তা অবশ্যই হতে পারে। (আনআম ৬ : ৮০)।

(হুদ -এর জাতির লোকেরা তাঁকে বললো) আমরা বলবো, আমাদের কোনও এক ইলাহ তোমাকে আভিশাপ করেছে। (হুদঃ ৫৪)

মূলত জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের ইলাহ সম্পর্কে আশংকা করতো যে, আমারা যদি তাদেরকে কোনভাবে নারাজ করি বা আমরা যদি তাদের শুভ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হেয়ে পড়ি তাহলে আমাদের উপর রোগ-শোক, অভাব -অনটন, জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি এবং নানা রকমের বিপদ আপতিত হবে।

ইলাহ এর তৃতীয় অর্থ

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত পুরোহিতদেরকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে মসীহ ইবনে মরিয়ামকেও রব বনিয়েছে। অথচ তাদেরকে কেবল এক ইলাহর ইবাদাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই। (সূরা তওবা ৯ : ৩১)।

তুমি কি তাকে দেখেছ? যে তার কামনা-বাসনা (প্রবৃত্তি) কে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তুমি কি এরূপ ব্যক্তিকে সঠিকপথে নিয়ে আসার দ্বায়িত্ব নিতে পার? (ফুরকান ২৫:৪৩)।

এমনি করে অনেক মুশরেকদের জন্যে তাদের মনগড়া শরীকরা (অর্থাৎ ইলুহিয়াতের ব্যাপারে অংশীদাররা) নিজেদের সন্তান হত্যার কাজকে কতই না সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। (আনআম ৬ : ১৩৭)।

তাদের কি এমন শরিক (অর্থাৎ উলুহিয়াতের ব্যাপারে অংশীদার) রয়েছে, যারা তাদের জন্যে এমন শরীয়ত নির্ধারণ করেছে, যার আল্লাহ অনুমতি দেন নি। (আশ-শুরা ৪২ : ২১)।

এসকল আয়াতে ইলাহের যে অর্থ করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী ইলাহের চেয়ে ভিন্ন। এখানে ইলাহ বলতে এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি হালাল হারাম, বৈধ-

অবৈধ নির্ধারণের চূড়ান্ত মালিক। অত্র আয়াতগুলোতে গায়রুল্লাহকে আইন বিধান রচনা, হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করেছিল। অথচ আইন, বিধান রচিত হতে হবে, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করতে হবে কেবলই আল্লাহর বিধান তথা শরী'আর আলোকে। শরীআহ ব্যতীত প্রবৃত্তি,গুরু,সংসদ,গণতন্ত্র,ব্যক্তিমত ইত্যাদিকে শরীআর উপর প্রাধান্য দিলে তা অবশ্যই উলুহিয়্যাতে শিরক হবে। কিন্ত বর্তমানে মূর্তি,কবর,মাজার পূজাকে শিরক বলা হলেও। ইলাহের এই অর্থকে নানাভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ আজ এই প্রকারের শিরকের ফিতনায় আক্রান্ত। তারা এসকল ইলাহদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ এটি হচ্ছে সেই শিরক যার অধীনে অন্যান্য শিরকগুলি তাদের আগাগোড়া, ডালপালা সমস্ত কিছু বিস্তার লাভ করার সুযোগ-সুবিধা,বৈধতা পায়।

আমাদের দেশের এত কবর,মাজার,ভণ্ড পীর পূজার কারণ কি শুধুই অজ্ঞতা?? বরং প্রকৃত বাস্তবতা হল প্রশাসনই তাওহীদের উপর নেই। তারা গণতন্ত্রের পূজায় লিপ্ত। তাদেরই ছত্র ছায়ায় এসব শিরকের আখড়াগুলি বন্ধ হওয়ার বদলে আরো বেশী গড়ে উঠছে।

মোদ্দাকথা এই যে ইলাহ হল সেই সত্তা যিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত প্রকার ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। কিন্ত মিথ্যা ইলাহ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ মিথ্যা ইলাহের মাঝে সত্যিকার উলুহিয়্যাতের গুণ নেই। সে না কল্যাণ অকল্যাণের মালিক, আর না সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার বিপদ থেকে উদ্ধারে সক্ষম। আর না সে শরীয়ত ব্যতীত নিজ থেকে হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার রাখে। বরং এসবই একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। তিনি সৃষ্টি করেছেন। অতএব বিধানও তিনিই দিবেন।
জেনে রাখ সৃষ্টি যার বিধান চলবে তার।

আমরা যখন কালেমার এই অর্থগুলোকে আমাদের সামনে রেখে একে (উঁচু, বিজয়ী,বুলন্দ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় অংশ নেবো। তখনই আমাদের জিহাদ হবে সত্যিকার আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। তখনই সেটা হবে দ্বীন কায়েম তথা তাওহীদ কায়েমের পথ।

যেমনটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সত্যিকারের মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কালেমাকে উঁচু, বিজয়ী, বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করে।

যারা কালেমার জিহাদকে অস্বীকার করছে তারা কালেমার মর্মই বুঝতে পারেনি।

তারা ইলাহকে চিনতে পারেনি। ইলাহকে চিনতে পারলেই। অথবা তারা কালেমার ইলম গোপনকারী। আল্লাহ আমাদের এর থেকে রক্ষা করুক।

ইলাহের মর্ম বুঝার মাধ্যমেই আমরা কালেমার মূল স্বাদ আস্বাদন করতে পারবো।

সেই সাথে এসমস্ত মিথ্যা ইলাহগুলিকে জেনে-বুঝে অস্বীকার করতে পারবো।

আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক। আমীন।

ওমা 'আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

চলবে... ইনশা আল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৯৯

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন "ঈমান বিল্লাহ" কি?

(জান্নাত লাভের উপায় -০৫)

imam ibnu taimiah

Junior Member

১২-৩০-২০১৮

বিগত পর্বগুলোতে আমরা তাওহীদের প্রথম রূকন "লা ইলাহা" (আল কুফর বিত তাগুত) সম্পর্কে জেনেছি। আজকে আমরা আলোচনা করবো তাওহীদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রূকন "ইল্লাল্লাহ" তথা ঈমান বিল্লাহ।

প্রশ্ন হল আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহীদের) উপর ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়? আর কীভাবে আমরা ঈমান বিল্লাহ তথা এক আল্লাহর তাওহীদের প্রতি ঈমান আনবো??
প্রথমত আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনা বলতে তাওহীদে রবুবিয়্যাত, তাওহীদে আসমা উস সিফাত, তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ ও তাওহীদে উলুহিয়্যাত এর সমুষ্টিকে বুঝায়। এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর তাওহীদের উপর ঈমান আনা যায়।

তাওহীদের এই প্রকারগুলোর ব্যাখ্যা কি??

১) তাওহীদে রবুবিয়্যাত : দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন এক ও একক। তিনিই সৃষ্টিককর্তা,রিযিকদাতা,আসমান-যমীনের পরিচালনাকারী। তিনিই প্রতিপালক বিশ্বজগতের, তিনিই জীবন-মৃত্যুর মালিক, বিশ্বজাহানের পরিচালনাকারী একমাত্র তিনি। অর্থাৎ এক কথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু কাজ বিশ্বজাহানে সংঘটিত হয় তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই হল তাওহীদে রবুবিয়্যাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

‘তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই। আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্গত করেছি আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে’। (আ'রাফ ৭ : ৮৫)।

২) তাওহীদে আসমা উস সিফাত : আল্লাহ তা আলার গুণবাচক নামসমূহ জানা, বুঝা,বিশ্বাস স্থাপন, স্বীকার করা এবং এতে কাউকে শরীক না করাই হচ্ছে তাওহীদে আসমা উস সিফাত।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

“আল্লাহর আছে সুন্দর সুন্দর নাম, সেই নামের মাধ্যমে তোমরা তাঁকে ডাক। (সূরা আরাফ ৭: ১৮০) ।

আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নক্ত বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে :

ক) তাহরীফ (বিকৃত,পরিবর্তন,পরিবর্ধন) না করা : আল্লাহর নামগুলির কোন রকমের বিকৃতি, পরিবর্তন করা যাবে না।

খ) তাতীল (অস্বীকার করা যাবে না) : আল্লাহর আসমা উস সিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করা যাবে না।

গ) তামফীল (সাদৃশ্য বর্ণনা করা যাবে না) : আল্লাহর সাথে কোন কিছুর সাদৃশ্য স্থাপন করা যাবে না। আল্লাহর মত কিছুই নেই। তিনি সাদৃশ্যহীন।

ঘ) তাকয়্যিফ (কাইফিয়ত বর্ণনা করা যাবে না) : যেমন : আল্লাহ আরশে সমুন্নত। এখানে প্রশ্ন করা যাবে না তিনি কীভাবে সমুন্নত হয়েছেন? এরূপ প্রশ্ন করা বিদআত। বরং এর উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

এছাড়াও আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতে নীচের লিংকে থাকা বইটি নামিয়ে নিতে পারেন।

https://www.quraneralo.com/beautifull-names-of-allah/

৩) তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ: বিধান এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা

আলাকে এক ও একক হিসেবে মানা। আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র বিধান ও সংবিধান প্রণয়নকারী। তিনিই বিধান ও সংবিধান রচনাকারী এই বিশ্বাস স্থাপন করা। তার বিধানের বিপরীত সংবিধান প্রত্যাখ্যান করা।

বিধান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর। (ইউসুফ ১২ : ৪০)।

আর আল্লাহ আদেশ করেন। তার আদেশ রদকারী কেউ নেই। (রাদ ১৩ : ৪১)।

তিনি (আল্লাহ) কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (কাহফ : ২৬)।

তারা কি জাহেলী যুগের বিধান কামনা করে? আর বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী কে? (মায়িদা: ৫০)।

"অথবা তাদের কী আল্লাহর সাথে অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য একটি দ্বীন নিয়ে এসেছে আল্লাহ যার অনুমতি দেন নি? ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো। এবং নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যান্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'' (শূরা ৪২ : ২১)।

"... এবং তারা (বিরোধের ক্ষেত্রে) ফায়সালার জন্য তগুতের কাছেই যেতে চায় যদিও তারা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদের সুদূর বিপথে নিয়ে যেতে চায়।'' (নিসা ৪: ৬০) ।

৪) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ : ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে মানা, একনিষ্ঠ খালেসভাবে আল্লাহর জন্যই দ্বীনকে নির্ধারণ করা। মিথ্যা ইলাহ, শিরক এবং মুশরিকদের থেকে বারাআহ (সম্পর্ক ছিন্ন) করা।

অর্থাৎ তাওহীদে উলুহিয়্যাত হল ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা আলাকে এক ও একক হিসেবে মানা, শুধুমাত্র আল্লাহরই দ্বীন মেনে চলা বাকী সব দ্বীন বাতিল করা,শুধুমাত্র তারই কাছে নিজের সমস্ত ইবাদাত বন্দেগী উৎসর্গ করা এবং এতে কাউকে শরীক না করা,এর কোন অংশই অন্য কাউকে প্রদান না করা। শিরক এবং মুশরিকদের থেকে (দ্বিনী,আকিদাহ,আউলিয়ার) সম্পর্ক ছিন্ন করা।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে

তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য। যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনছো। (মুমতাহিনা ৬০ : ০৪)।

এছাড়াও উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরা ঘোষণা দেই যে, আমরা গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী,ইবাদাত করবো না ;

দুআ,প্রার্থনা করবো না ; আশ্রয়,সাহায্য,উদ্ধার,মদদ চাইবো না, সিজদা করবো না; জবাই করব না; নযর/মান্নত করব না ; শিফা,আরোগ্যতা,সুস্থতা ও সফলতা চাইব না, কামনা করব না, এগুলোর মালিক মনে করব না।

ক্ষতি অনিষ্টের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই বিপদ হতে আশ্রয়দানকারী, উদ্ধারকারী, সাহায্য ও মদদ দানকারী। সফলতা কল্যাণ-অকল্যাণ,ক্ষতি-অনিষ্টের একমাত্র মালিক তিনি।

(দুআ,প্রার্থনা,আশ্রয়,সাহায্য,উদ্ধার,মদদ,সাজদা,জবাই,নযর,মান্নত,শিফা,সফতা ,ক্ষতি-অনিষ্ট) এসব কিছুই আল্লাহর কাছে চাইব এবং তিনিই এগুলো দানকারী ও এর একমাত্র মালিক।

এই তাওহীদে উলুহিয়্যাতের দ্বা ওয়াত নিয়েই প্রত্যেক নাবী রাসূলগণ এসেছিলেন, প্রত্যেক নাবী রাসূলগণের দ্বাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিলো তাওহীদে উলুহিয়্যাত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুশরিকরা উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করত, যা বর্জন করে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন নবী রাসূলগণ। অর্থাৎ ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করা। ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন। এই তাওহীদের দিকে দ্বাওয়াত দেওয়াই হল প্রথম ফরজ।

টীকা: তাওহীদের সংজ্ঞা হচ্ছে উলুহিয়্যাত,রবুবিয়্যাত ও আসমা উস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে মানা।

বি.দ্র : আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নিকট দুআ,আবেদন করা,চাওয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিন শর্তসাপেক্ষে জায়েজ রয়েছে। যথা :

১) জীবিত ও উপস্থিত থাকা : যার কাছে চাওয়া হচ্ছে সে জীবিত পার্থিব দৃষ্টিতে উপস্থিত ব্যক্তি হতে হবে,

২) ক্ষমতা : যা চাওয়া হচ্ছে তা প্রদান করার ক্ষমতা ও শক্তি থাকতে হবে। যেমন: আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান লাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে যদি কেউ মাজারে বা কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নিকট সন্তান চাই তহলে সে

৩) আকিদাহ ও সুন্নাহ : সর্ব প্রথম আল্লাহর কাছেই নিজের সমস্ত কিছু চাইতে হবে। অত:পর পার্থিব এই বিষয়গুলির নিকট এই বিশ্বাসে দ্বারস্থ হওয়া,ব্যবহার করা যে, এইগুলোর নিজস্ব কোন ক্ষমতা,শক্তি নেই এবং এগুলো কোন ভাল-মন্দ সাধন করতে পারে না বরং সমস্ত কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার হুকুম ছাড়া কেউ কোন কল্যাণ-অকল্যাণের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা রাখে না, আমি এগুলোকে শুধুমাত্র এই নিয়তে ব্যবহার করছি যে, যেহেতু রাসূল (সা.) আসবাব হিসেবে এগুলো গ্রহণ করেছেন এবং করতে বলেছেন। তাই কেবলই সুন্নাহর অনুসরণস্বরূপ আমি এগুলো গ্রহণ ও ব্যবহার করছি। নতুবা কোন কিছুরই কোন ক্ষমতা নাই।

ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

চলবে.... ইনশা আল্লাহ...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯২৪

*****